সূচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮ সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রতিবেদন থেকে আহরিত)

১২৭৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন – 'এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতের নিয়মাধীন জলবুদ্‌বুদ্‌স্বরূপ ভাসিল; নিয়মবলে বিলীন হইবে।' চারি বৎসর পরে বঙ্গদর্শনের বিদায়গ্রহণকালে লিখিয়াছিলেন–'বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্‌বুদ্‌ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবুদ্‌বুদ্‌ জলে মিশাইল।' এই নশ্বর জগতে জলবুদ্‌বুদ্‌ের সহিত কাহার তুলনা না হয়? ক্ষুদ্র সাময়িক পত্রের তো কথাই নাই, অতুলপ্রতাপান্বিত রোম সাম্রাজ্য, বিপুলবৈভবশালী মোগলসাম্রাজ্য কালস্রোতে জলবুদ্‌বুদ্‌ের ন্যায় উদয় হইয়াছিল, বুদ্‌বুদ্‌ের ন্যায় লীন হইয়াছে। কিন্তু জলবুদ্‌বুদ্‌ উঠে, মিলায়; আবার উঠে, আবার মিলায়, আবার উঠে। আবির্ভাব, তিরোভাব, পুনরায় আবির্ভাব, ইহাই বিশ্বের নিয়ম, বিনাশ কিছুরই নাই।

চারি বৎসর পরে বঙ্গদর্শন-জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল বলিয়া যে আর কখনো পুনরুদিত হইবে না, এমন কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেন নাই। সেই সময় বঙ্গদর্শন প্রচার-রহিত হওয়াতে যাঁহারা আহ্লাদিত হইয়াছিলেন অথবা যাঁহাদিগের আহ্লাদিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়া ছিলেন – 'তাঁহাদিগকে একটি মন্দ সংবাদ শুনাইতে আমি বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাতত রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনো যে এই পত্র পুনরুজ্জীবিত হইবে না এমত অঙ্গীকার করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ বা অন্যতঃ ইহা পুনর্জীবিত করিবার ইচ্ছা রহিল'। ফলেও ঘটিয়াছিল তাহাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ সাহায্যে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকতায়

বঙ্গদর্শন পুনর্জীবিত হইয়াছিল। পরে সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র দুইজনেই বঙ্গদর্শন শ্রীশবাবুকে দিয়া যান।* ৫ম বর্ষে বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রচারসময়ে ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন – বঙ্গদর্শনের লোপজন্য আমি অনেকের কাছে তিরস্কৃত হইয়াছি। সেই তিরস্কারের প্রাচুর্যে আমার এমত প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বঙ্গদর্শনে দেশের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বলিয়া, ইহা পুনর্জীবিত হইল।

'যাহা একজনের উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বঙ্গদর্শন যত দিন আমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবনের উপর নির্ভর করিবে তত দিন বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব অসম্ভব। এজন্য আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ববিধান করাই আমার উদ্দেশ্য।' বঙ্কিমের এ উদ্দেশ্য কি সফল হইবে না? বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বাঙালীর হইবে না?

গ্রন্থরচনায় ও সাময়িকপত্র সম্পাদনে প্রভেদ আছে। গ্রন্থ ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভা ও অধ্যাবসায়ের ফল। কিন্তু সাময়িক পত্র বহুলোকের সমবেত উদ্যমে জীবিত থাকে। ইংরাজী বা ইউরোপীয় অনেক সংবাদপত্রের বয়ঃক্রম শতাধিক বর্ষ হইয়া গিয়াছে। টাইমস্-পত্রের যে কখনও আয়ুক্ষয় হইবে, তাহা মনে হয় না। যতদিন ইংরাজ জাতি থাকিবে, ততদিন ইংরাজ জাতির প্রধান সংবাদপত্র থাকিবে। এই দীর্ঘজীবনের মূলে পারম্পর্যের নিয়ম। রাজার অভাবে রাজকার্য যেমন স্থগিত বা রহিত হয় না, সেইরূপ প্রসিদ্ধ পত্রের প্রচার কখনও বিলুপ্ত হয় না; কালের অলঙ্ঘ্য নিয়মে লেখক, পাঠক ও গ্রাহকের পরিবর্তন হইতে থাকে, এইমাত্র। কেবল কি এই হতভাগ্য বঙ্গদেশ জাতীয় গৌরবের নিদর্শন-পরম্পরা রক্ষা করিবে না?

একথা কেহ কেহ বলিবেন, এখন তো বঙ্গদর্শন একটা নাম মাত্র। যিনি বঙ্গদর্শনের প্রাণ ছিলেন, তিনিই যখন বর্তমান নাই, তখন কোন মাসিকপত্রের পক্ষে বঙ্গদর্শন নামও যাহা, অন্য নামও তাহাই। কিন্তু আমরা নামকে নামমাত্র মনে করি না। যে-নামকে বঙ্কিমচন্দ্র গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, সে নামের মধ্যে সেই স্বর্গীয় প্রতিভার একটি শক্তি রহিয়া গিয়াছে। সেই শক্তি এখনও বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যের ব্যবহারে লাগিবে, সেই শক্তিকে আমরা বিনাশ হইতে দিতে পারি না।

বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এ-পত্রের সম্পাদক যিনিই হউন না কেন, বঙ্গদর্শন নামের মধ্যে বঙ্কিম স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন। বঙ্গদর্শনের যে সকল প্রাচীন মহারথী এখনও ইহলোকে

---

* বঙ্গদর্শন প্রচারের সংকল্প সময়ে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ই ইহার সম্পাদক হইবেন কথা ছিল। কিন্তু তিনি এক্ষণে সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিতে পারিলেন না। বর্তমান সম্পাদক মহাশয় আমাদের সানুনয় অনুরোধে অনুগ্রহপূর্বক এই ভার গ্রহণ না করিলে, সে সংকল্প এত সত্বর কার্যে পরিণত হইত কি না সন্দেহ। তাঁহাকে সম্পাদকরূপে পাইয়া আমরা অধিকতর উৎসাহে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার

আছেন, তাঁহার এই নামের পতাকা উড্ডীন দেখিলে ইহার তলে সমবেত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। এবং যে-সকল আধুনিক লেখক বঙ্গদর্শনের গৌরবকালের ইতিহাস শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছেন, বঙ্গদর্শন নামে তাঁহারা নিজের রচনার আদর্শকে যথাসাধ্য চেষ্টার উন্নত রাখিবার প্রয়াস পাইবেন। পাঠকের দাবি যত কঠিন হয়, সম্পাদকের চেষ্টাও তত একান্ত হইয়া থাকে। বঙ্গদর্শন নামে পাঠকের প্রত্যাশা বাড়িয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই; এবং সেই প্রত্যাশার বেগে সম্পাদককেও সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে। সম্পাদক একথা ভুলিতে পারিবেন না যে, বঙ্গদর্শন নামের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন – সেই বঙ্কিমচন্দ্রের কঠিন আদর্শ ও কঠোর বিচার তাহাকে সর্বপ্রকার শৈথিল্য হইতে রক্ষা করিবে।

অধুনা বঙ্গদেশে যে-কেহ সুলেখক আছেন, বঙ্গদর্শন তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে ঐতিহাসিক সূত্রে বঙ্কিমের কালের সহিত গ্রথিত করিয়া লইবে, ইহা বঙ্গসাহিত্য ও বাঙালী লেখকদিগের পক্ষে প্রার্থনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। কালের সহিত কালান্তরের যোগসূত্র যতই দৃঢ় হইবে, ভাবের পথ ততই সুদূরবিস্তৃত এবং সাহিত্যের আদর্শ ততই প্রশস্ত হইতে থাকিবে। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন যদি কেবল বঙ্কিমের কালের মধ্যেই স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, জীবিতকালের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তবে স্বভাবের নিয়মে তাহা কালক্রমে ধূলিসমাচ্ছন্ন ইতিহাসের বিবরমধ্যে অদৃশ্যপ্রায় হইয়া আমাদের নিত্যব্যবহারের অতীত হইয়া যাইবে। মহাপুরুষদিগের কীর্তি এক কালকে অন্য কালের সহিত বাঁধিবার জন্য যোগসূত্রের কাজ করে। যাঁহারা জাতিগত মাহাত্ম্যের প্রার্থী, তাঁহার সেইরূপ কোন যোগসূত্রকেই নষ্ট হইতে দিতে চাহেন না। তাঁহার অতীতকে ভবিষ্যতের সহিত আবদ্ধ করিয়া জাতীয় জীবনের লীলাভূমিকে সুবিস্তীর্ণ করিবার জন্য সকল প্রকার উপায়ই অবলম্বন করেন। বঙ্গদর্শন বহন করিয়া চলাও বঙ্গসাহিত্যকে অপরিচ্ছিন্ন ও প্রশস্ত রাখিবার একটি উপায়। এই সূত্রযোগে বঙ্গসাহিত্যের যদি একটি মালা গাঁথা যায়, তবে তাহা ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইবে না, বঙ্গলক্ষ্মীর কণ্ঠে চিরভূষণ হইয়া বিরাজ করিতে থাকিবে। অবশ্য একথা মনে রাখিতে হইবে, এক কালের সহিত অন্য কালের প্রভেদ অনিবার্য। যদিও দীর্ঘকালের ব্যবধান নহে, তথাপি প্রথমে বঙ্গদর্শনের কালের সহিত বর্তমান কালের অনেক প্রভেদ হইয়াছে। সে প্রভেদ উন্নতির দিকে কি অবনতির দিকে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; কিন্তু সে প্রভেদ যে ব্যাপকতার দিকে, তাহা অসংকোচে বলিতে পারি। তখন ইংরাজী রচনার দুরাকাঙ্ক্ষা শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে প্রবল ছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙালী লেখক এবং পাঠক অল্পই ছিল। সেই সংকীর্ণ খাতের মধ্যে বঙ্কিম আপন প্রবল প্রতিভা প্রবাহিত করিয়া সাহিত্যের স্রোতঃপথকে গভীর ও ক্রমশঃ প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখনকার সেই নির্ঝরধারাটি বঙ্কিমের ব্যক্তিগত

প্রবাহের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তিনি তাহাকে গতি দিয়াছিলেন এবং তিনি তাহার দিক্‌নির্দেশ করিয়াছিলেন। সেই ধারাটির মধ্যে সর্বত্রই যেন তিনি দৃশ্যমান ও বহমান ছিলেন; সংকীর্ণ ধারার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভাবের বেগ ও সৌন্দর্য সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হয়। আধুনিক সাহিত্যে আমরা প্রতিভার সেই ব্যক্তিগত প্রভাবের প্রবল স্বাদ উপভোগ করিবার প্রত্যাশা আর করিতে পারিব না। এখন লেখক ও পাঠকের সংখ্যা গণিয়া ওঠা কঠিন। এখন রচনা বিচিত্র; রুচি বিচিত্র। এখন লেখক-পাঠকের মধ্যে নানাপ্রকার শ্রেণীর বিভাগ ঘটিয়াছে। এখন সুলভ সংবাদপত্র প্রকাণ্ড জাল নিক্ষেপ করিয়া দূরদূরান্তর হইতে অগণ্য পাঠক সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে এবং নব নব রঙ্গশালা নানা উপায়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করিয়া সাহিত্যপণ্যকে নানা দলের চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা করিতেছে।

অতএব এখনকার বঙ্গদর্শন কোন উপায়েই তখনকার বঙ্গদর্শনের স্থান, লইতে পারিবে না। এমনকি এই বঙ্গদর্শন সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একমাত্র মুখপত্র হইবার আশাও করিতে পারি না। এই বঙ্গদর্শন-সম্পাদক, বঙ্গদর্শনের আদি সম্পাদকের ন্যায় সমস্ত পত্রটিকে নিজের অপ্রতিহত প্রভাবের দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া লেখকদিগকে নিজের প্রতিভাবন্ধনে বাঁধিবার স্পর্ধা রাখেন না। একমাত্র চেষ্টা হইবে, বর্তমান বঙ্গচিত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা। কাজটা কঠিন। কারণ ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হওয়াতে চিরস্থায়ী পত্রের সহিত বিচিত্র মৃগতৃষ্ণিকার প্রভেদ নির্ণয় করা দুরূহ হইয়াছে। এক্ষণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণও স্বভাবতই নানা শক্তির দ্বারা নানা পথে আকৃষ্ট হইতেছেন। কালের বিরাট কণ্ঠস্বর নানা ক্ষুদ্র কোলাহলের দ্বারা বিক্ষিপ্ত। কিন্তু আমরা একান্ত মনে আশা করি, বঙ্গদর্শন এই সকল সামাজিক কলকোলাহল হইতে নিজেকে সুদূরে রক্ষা করিয়া সাহিত্যের আদর্শকে নিত্যকালের অচল শিখরের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবে। এ প্রতিজ্ঞা আমরা বিনয়ের সহিত এবং আশঙ্কার সহিত করিতেছি। সাময়িক অনিত্য আকর্ষণগুলি অত্যন্ত প্রবল; এবং অধিকাংশের রুচি তুমুল কলহ চীৎকারের সহিত যাহা চাহে, তাহা পূর্ণ না করা অত্যন্ত সাহস ও বলের কাজ। অতএব এই মহাজনতার সংঘর্ষে সম্পাদকের ব্রতদণ্ড মাঝে মাঝে স্খলিত হইয়া পড়িবে না, একথা কে বলপূর্বক বলিতে পারে? কিন্তু সেরূপ ব্রতভঙ্গের জন্যও আমরা ক্ষমা চাহি না। আমরা যখন বঙ্গদর্শন আশ্রয় করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি তখন আমরা কঠিন বিচার প্রার্থনা করি। ভীরুতা, রুচিভ্রংশ, সত্যের অপলাপ এবং সর্বপ্রকার সাহিত্যনীতির শৈথিল্য আমাদের পক্ষে অমার্জনীয়। আশা করি, সতর্ক পাঠকগণ আমাদিগকে চালনা করিবেন।

লোকমনোমোহিনী বহুমুখী প্রতিভার বলে বঙ্গদর্শন প্রতিষ্ঠিত; মঙ্গলময়ের মঙ্গলাশীর্বাদে সে প্রতিষ্ঠা রক্ষিত হউক।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মশিক্ষা

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ-১৩২২ সংখ্যা' থেকে আহরিত)

শ্রাবণ মাসের ''নারায়ণ'' পত্রিকায় পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ''বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃ-প্রসঙ্গ'' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। যখন আমরা উভয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের বাটীতে মিলিত হইলাম (আমি তখন রঙ্গপুরে একজন ডেপুটি ছিলাম) ঐসময় বঙ্কিম প্রসঙ্গ উঠিত ও আমার পিতৃদেবের কথা আমার মুখে শুনিতেন (ইহার প্রায় আট মাস পূর্বে আমার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন) এবং তাহা অবলম্বনে আমাদের পিতৃ-প্রসঙ্গ প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন। ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত এবং তেজস্বী পুরুষ আমি কদাচিৎ দেখিয়াছি। বঙ্কিমবাবুর সহিত তখন তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল না, তথাচ তাঁহার গ্রন্থাদি পড়িয়া ডাক্তার ঘোষ তাঁহার গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমবাবুর কথা উত্থাপন করিতেন। আমি তখন বুঝিতে পারি নাই যে, পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর একদিন বাংলার পণ্ডিত-সমাজের অগ্রণী হইবেন; তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এটা আসিয়াছিল যে, তিনি একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান, এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত।

বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশই অমূলক। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ঐরূপ একটা কথা লইয়া ''নারায়ণ'' ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছেন। সে কথাটি এই–'পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ও সংসর্গদোষে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বজীবন কিঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত হইলেও, পরে তাহা সংশোধিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় এই সময়ে আলবার্ট হলে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা

আরম্ভ করিয়া দেন। তাঁহার শ্রোতা ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র, বন্ধুবর ইন্দ্রনাথ, ...শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি মনীষিগণ। ইহাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপকার হয়, পিতৃপিতামহের ধর্মের দিকে আকর্ষণ বাড়িয়া উঠে।'

এই কথা কতদূর অসঙ্গত, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে নিম্ন উদ্ধৃত মন্তব্য পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই বক্তৃতা সভার দিন-দুই যাইয়া বঙ্কিমবাবু আর যাইলেন না, তাহাতে অনেকে বিস্মিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। তিনি গত বৈশাখ মাসের "নারায়ণ" পত্রিকার "বঙ্কিম-স্মৃতি" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, 'দুই-তিনটি বক্তৃতায় উপস্থিত হইবার পর আর তাঁহাকে (বঙ্কিমবাবুকে) দেখা গেল না। তখন আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কৌতূহল জন্মিল। আমি একদিন সুবিধামতো তাঁর সঙ্গে দেখা করিলাম। প্রসঙ্গক্রমে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার কথা তুলিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কয়দিন তাঁর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। এরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে কতকগুলি অসার লোকে নাচিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে পারে, কিন্তু ওতে কোনো স্থায়ী ফল হইতে পারে না। মালা, তিলক, ফোঁটা ও শিখা রাখায় যে ধর্ম ট্যাঁকে, আর ঐগুলির অভাবে যে ধর্ম লোপ পায়, সে ধর্মের জন্য দেশ এখন আর ব্যস্ত নহে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, তিনি এখনো বুঝিতে পারেন নাই যে, নানাসূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে, দেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম চায়। কি হইলে এ দেশের সমাজ-ধর্ম এখন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, সে জ্ঞানই এঁদের নাই, তাই যা-খুশি-তাই বলিয়া লোকের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত?"

এই মন্তব্য পাঠ করিয়া কি বুঝা যায় যে, চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া বঙ্কিমবাবুর উপকার হইয়াছিল, এবং পিতৃপিতামহের ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়াছিল?

আসল কথা এই যে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্ম ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি বক্তৃতা দিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়া বঙ্কিমবাবুর সাহায্য চান। তাঁহার নিকট সাহায্য চাহিবার কারণ এই যে, তখন তিনি "নবজীবনে" ও "প্রচারে" হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু স্বীকৃত হইলে তাঁহার বাটীতে ঐ উদ্দেশ্যে একটি অন্তরঙ্গ সভা বসে, তাহাতে অনেক সাহিত্যিক ও স্বধর্মনিষ্ঠ ভদ্রলোক উপস্থিত হন। অ্যালবার্ট হল বক্তৃতার স্থান স্থির হইল; বক্তৃতার একটা দিনও স্থির হইল। প্রথম দিবসে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল শ্রোতা ছিলেন এমত নহে, তিনি সভাপতিত্বে বৃত হইয়া চূড়ামণি মহাশয়কে শ্রোতাদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। তার পর দুই একদিন মাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন। আর যান নাই। তাঁহার বিবেচনায় চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যাখ্যাত ধর্ম এক্ষণে এই দেশের উপযোগী নহে।

ইহার বহুপূর্ব হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পিতৃদেবের উপদেশে এবং সংস্কৃত গ্রন্থাদি পড়িয়াই তাঁহার হৃদয়ে প্রথম ধর্মের উদ্দীপন হয়। আমাদের মাতামহ সেকালে সংস্কৃত শাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহুব্যয়ে ও বহুযত্নে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলি সেকালে দুষ্প্রাপ্য ছিল এখন তো বটেই। বঙ্কিমবাবুর সংস্কৃতের দিকে বড় ঝোঁক দেখিয়া আমাদের মাতুল ঐ সমুদয় গ্রন্থ তাঁহাকে

দিয়াছিলেন। উহা পাইয়া তিনি প্রত্যেক গ্রন্থখানি নূতন খেরুয়া কাপড়ে বাঁধিয়া একটি আলমারি সাজাইলেন, আলমারি ভরিয়া গেল। ইহার মধ্যে কোন্ শাস্ত্র না ছিল। এমন কি, জ্যোতিষ ও তন্ত্রের পুঁথিও ছিল। সেজন্য তিনি ফলিত-জ্যোতিষ শিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলি পড়িয়াই বঙ্কিমবাবুর সংস্কৃত-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য জন্মে। নতুবা শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের টোলে মাঘ, ভারবি, নৈষধ প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্য পড়িয়াই তাঁহার সংস্কৃত-বিদ্যার খতম হইত। এই সময় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি গ্রন্থের পঠন ত্যাগ করিয়া কেবল সংস্কৃত গ্রন্থের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তারপর যখন হুগলীতে বদলী হইয়া আসিলেন, তখন কয় বৎসর পিতৃদেবের নিকট থাকিয়া ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। কিছুদিন চুঁচুড়ায় থাকিতে হইয়াছিল; তথাপি রবিবারে রবিবারে কাঁঠালপাড়ায় আসিতেন। এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম শিক্ষা হইল। এই শিক্ষার প্রভাবেই তিনি তর্কচূড়ামণির হিন্দু-ধর্ম ব্যাখ্যায় আস্থা প্রদর্শন করেন নাই, এই শিক্ষার ফলেই তাঁহার মন কখনো ধর্মপ্রচারকদের বক্তৃতায় গলিয়া গিয়া হিন্দু-ধর্মের দিকে প্রবাহিত হয় নাই; এই শিক্ষার ফলেই তিনি ধর্ম-তত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, এই শিক্ষার ফলেই তিনি গীতা ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই শিক্ষার প্রভাবেই তিনি ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে এক ধারাবাহিক বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা শেষ করিতে না পারিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। কোনো ধর্মপ্রচারকের নিকট তিনি হিন্দুধর্ম শিক্ষা পান নাই। তাঁহার একমাত্র ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন আমাদের পিতৃদেব। দেবীচৌধুরানী গ্রন্থখানি তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন; যাঁহার কাছে নিষ্কাম ধর্ম শুনিয়াছি, যিনি স্বয়ং নিষ্কাম ধর্ম ব্রত করিয়াছিলেন' –ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্রের চুঁচুড়ায় থাকাকালেই পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পরই তাঁহার ভিতরে একটা গুরুতর পরিবর্তন হয়। ইহার পর যাহা লিখিতেন, তাহাই হিন্দু-ধর্ম বুঝাইবার উদ্দেশ্যে লিখিতেন; ইহার পর যে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই ঐ উদ্দেশ্য থাকিত। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি আপনার কণ্ঠদ্বারা যে হিন্দু-ধর্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র কলমের দ্বারা হিন্দু-ধর্মের ঠিক সেই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন, এমন বলা যায় না।

১৮৮১ সালে পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। উহার মাস কয়েক পরে সঞ্জীবচন্দ্রের "বঙ্গদর্শনে" "আনন্দমঠ" প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৮২ সালে "স্টেটসম্যান" সংবাদপত্রে হিন্দু-ধর্ম লইয়া রেভাঃ ডঃ হেস্টি সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের মসীযুদ্ধ হয়। ১৮৮৩ সালে "দেবীচৌধুরানী" বাহির হয়। ১৮৮৪ সালে "নবজীবন"-র প্রথম সংখ্যায় "ধর্মতত্ত্ব" প্রবন্ধাবলীর প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইহার পর ১৮৮৫ সালে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা আরম্ভ হয়। এখন পাঠক মহাশয়রা বলুন দেখি, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতায় বঙ্কিমচন্দ্রের মন হিন্দু-ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল কি?

বঙ্কিম সম্বন্ধে পণ্ডিতরাজ আর একটি কথা লিখিয়াছেন, তাহা অমূলক। যথা 'সত্য মিথ্যা জানি না, স্বর্গীয় ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছি, শেষ জীবনে নাকি বঙ্কিমচন্দ্র জপের মালা গ্রহণ করিয়াছিলেন।' আমি যতদূর জানি বঙ্কিমচন্দ্র জাপক ছিলেন বটে তবে জপের মালা

ঘুরাইয়া জপ করিতেন না। আমাদের পিতৃদেবও জাপক ছিলেন, তিনিও কখনো জপের মালা গ্রহণ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বে প্রায় চারি বৎসর আমি আলিপুরে বদলি হইয়া তাঁহার নিকটেই ছিলাম, কই, কখনো তো জপের মালা ঘুরাইতে তাঁহাকে দেখি নাই।

পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর আমাদের পিতৃদেবের সম্বন্ধে একটি ঘটনা লিখিয়াছেন, তাহা এরূপ শ্রদ্ধার সহিত লিখিয়াছেন যে, উহা আমি চিরকাল স্মরণ রাখিব। তিনি লিখিয়াছেন, ঐ ঘটনাটি আমার মুখে শুনিয়াছেন। সে আজ অনেক দিনের কথা, প্রায় ৩৪। ৩৫ বৎসর হইবে। ১৮৮১ সালে আমার সহিত তাঁহার দেখাশুনা হয়। এই দীর্ঘকালে যে আমার পিতৃদেবের কথাটি তাঁহার স্মরণ আছে, ইহা আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে নিজের ভিন্ন পরের কথা ভালরূপ স্মরণ থাকা সম্ভব নহে, এজন্য এ ঘটনার সম্বন্ধে তাঁহার দুই-একটি ভুল হইয়াছে। আমাদের পিতৃদেব প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে সেকালের প্রাচীন ও প্রাচীনাদের মুখে অনেক কথা শুনিয়াছি। ঐ গল্পগুলি এখানে বিবৃত করিতে আমার সাহস হয় না; ঐগুলি অলৌকিক ঘটনায় জড়িত। তবে এইরূপ ঘটনায় বুঝা যায় যে, সাধারণের ধারণা ছিল যে, পিতৃদেব বাল্যকাল হইতে দেবভক্ত ছিলেন, এবং দেবতা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। বোধহয় এই ভক্তির জন্যই ভগবান তাঁহাকে অষ্টাদশ বৎসর বয়সেই এক মহাপুরুষের দ্বারা দীক্ষিত করাইয়াছিলেন। পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তাঁহার প্রবন্ধে দীক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখেন নাই। ঐ মহাপুরুষের দ্বারা পিতৃদেবের দীক্ষা হওয়াতে, এই গল্পটি আমাদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে প্রচলিত ছিল ও আছে এবং আমিও পণ্ডিতরাজকে ও ডাক্তার কে.ডি. ঘোষকে বলিয়া থাকিব। প্রায় চারি বৎসর হইল, দীনবন্ধুর ষষ্ঠপুত্র শ্রীমান ললিতচন্দ্র এই ঘটনাটি "মানসী" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তাঁহার শুনা কথা। আমিও যাহা লিখিব নিঃসন্দেহে তাহাও আমার শুনা কথা।

আমাদের জ্যেষ্ঠতাত ৺কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাজপুরের নিমকপোক্তানের দারোগা ছিলেন। সেকালে ওইটি একটি লোভনীয় পদ ছিল; কেন না ঐ পদের মর্যাদাও খুব ছিল, এবং বেতনও ভাল ছিল। জ্যাঠামহাশয় ঐ স্থানে বহুকাল ছিলেন, এবং সে দেশের লোকের নিকট তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি সেখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; অদ্যাপি উহা কাশীনাথ মন্দির বলিয়া খ্যাত। আমাদের দেশের অনেক লোক তাঁহার নিকট থাকিয়া প্রতিপালিত হইত, তিনি সকলকেই এক-একটি চাকুরিও দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে তাঁহার পিসতুতো ভাই ৺ভজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একজন ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহারই নিকট নিম্নলিখিত ঘটনাটি শুনিয়াছিলাম।

পনর-ষোল বৎসর বয়সে পিতৃদেব তাঁহার পিতা কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া, আমাদের ঠাকুরের প্রধান পূজারীর নিকট কিছু টাকা কর্জ লইয়া একদিন রাত্রিযোগে গৃহত্যাগ করিয়া যাইলেন। যাজপুরে তাঁহার অগ্রজের নিকট যাইবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিলেন। পিতামহ পরদিন প্রত্যুষে উহা জানিতে পারিয়া দুইটি বিশ্বাসী লোক তাঁহার পশ্চাৎ পাঠাইলেন; কিন্তু পথে তাঁহার সহিত তাহাদের দেখা হইল না। পিতৃদেব পদব্রজে কয়দিনে যাজপুরে পৌঁছিলেন, সেইখানে তাহাদের

সহিত দেখা হইল। রাস্তায় তাঁহার কাপড় চাদর ও টাকাকড়ি চুরি গিয়াছিল কিনা, শুনি নাই। যাজপুরে কিছুদিন থাকিয়া পারসী ভাষা শিখিতে লাগিলেন। আমার জ্যাঠামহাশয় ঐ ভাষায় একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। পিতৃদেবকে ঐ ভাষা শিখাইবার জন্য একজন মুন্সী নিযুক্ত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে জ্যাঠামহাশয় অনুজকে এক্‌টিন্ দিয়া পিসতুতো ভাই ও দেশের লোকের তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে রাখিয়া মাস কয়েকের জন্য ছুটি লইয়া বাড়ি আসিলেন। একজন প্রধান কর্মচারী কাজ চালাইত; পিতাঠাকুর কেবল দস্তখত করিতেন। কিছুদিন পর তাঁহার জ্বর হইল। তখন তাঁহার অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম। অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি সেস্থানের লোকের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় অনেক লোক যাতায়াত করিতে লাগিল। জ্বর ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বিকারে পরিণত হইল; অবশেষে নাড়ী ত্যাগ হইল এবং তাঁহাকে বৈতরণী তীরস্থ করিতে হইল। প্রাণত্যাগ হইয়াছে বুঝিয়া, তাঁহাকে একখানি চাদরে ঢাকিয়া আত্মীয়েরা সৎকারের উদ্যোগ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ভীড় ঠেলিয়া ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুবিশিষ্ট জটাজুটধারী, পরিধানে গেরুয়া বসন, পদযুগলে খড়ম—এক অতি দীর্ঘকায় পুরুষ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। ইহার মূর্তি দেখিয়া সকলে ভূমিষ্ট হইয়া ইঁহাকে প্রণাম করিল। ভজকৃষ্ণ জ্যাঠামহাশয় তাঁহার পদযুগল ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'রক্ষা করুন।' ইঁহাকে দেখিয়া কাহারও সন্ন্যাসী বলিয়া ধারণা হইল না। সকলেই বুঝিল ইনি দৈবপ্রেরিত। এই মহাপুরুষ পিতৃদেবের নিকটে বসিয়া তাঁহার মুখ হইতে চাদর তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, 'কি সুন্দর! ছেলেটি কি সুন্দর!'—পরে বলিলেন, 'মরে নাই, জীবিত আছে,' এবং গরম দুধ আনিতে অনুমতি করিলেন। এই স্থলে পণ্ডিতরাজ লিখিয়াছেন যে সন্ন্যাসী মন্ত্রপূত জল ছিটাইতে ছিটাইতে পিতৃদেব সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু আমি শুনিয়াছি, মস্তক হইতে নাভি পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ দুই হস্ত চালনা করাতেই পিতাঠাকুর পাশমোড়া দিলেন। ক্রমে ঐরূপ করিতে করিতে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলেন। পরে কিছু দুগ্ধ পান করাইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে তাঁহাকে বাসায় আনা হইল। মহাপুরুষ স্বেচ্ছায় পিতার সহিত বাসায় আসিলেন, পরে তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া পিতাঠাকুর শয়নাবস্থাতেই তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন। মহাপুরুষ বলিলেন, 'ভয় নাই, তুমি সুস্থ হইয়াছ।' পিতা ঠাকুর কহিলেন, 'তাহা আমি জানি; তবে আমার একটি ভিক্ষা আছে।'

'কি ভিক্ষা? বল?'

'যদি আমার জীবন দান করিলেন, তবে আমায় দীক্ষিত করুন।'

মহাপুরুষ বিস্ময় বিস্ফারিতলোচনে অনেকক্ষণ পিতাঠাকুরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, পরে স্বীকৃত হইয়া একটি দিন স্থির করিয়া বলিয়া গেলেন যে, ঐ দিনের প্রত্যুষে স্নাত হইয়া থাকিবে। তিনি আসিয়া দীক্ষিত করিবেন। ঐ দিনের ঠিক সময়ে তিনি উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেবকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'না ভালরূপ তোমার স্নান করা হয় নাই, এস, আমি বৈতরণী হইতে তোমাকে স্নান করাইয়া আনি।' এই বলিয়া পিতা ঠাকুরের হস্ত ধারণ করিয়া বৈতরণীর জলে তাঁহাকে অনেকবার ডুব দেওয়াইয়া লইয়া আসিলেন। আমাদের ভজকৃষ্ণ

জ্যাঠামহাশয় তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া উহা দেখিয়াছিলেন। পরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া একটি ঘরে তাঁহার দীক্ষা আরম্ভ হইল। ইহা সমাপ্ত হইতে অনেক বিলম্ব হইল। বাসার লোকে অনাহারে ছিল। দীক্ষাকার্য শেষ হইলে, পিতার গুরুদেব দ্বার খুলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সকলেই লক্ষ্য করিল, তাঁহার পায়ে খড়ম নাই। খালিপায়ে চলিয়া গেলেন। ভজকৃষ্ণ জ্যাঠামহাশয় তখন দীক্ষাঘরে পিতাঠাকুরকে দেখিতে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, অষ্টাদশ বর্ষীয় সুন্দর কিশোর বালক পীতাম্বর-পরিধানে একটি আসনে বসিয়া হাসিতেছেন। কিন্তু তাঁহার ক্রোড়ে গামছা-বাঁধা একটি পুঁটুলি রহিয়াছে। তিনি পিতাঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। 'তোমার ক্রোড়ে কিসের পুঁটুলি দেখি।' যেমন কোনো শিশুর হাতের পুতুল কেহ দেখিতে চাহিলে সে উহা বুকে করিয়া 'না না' বলে, আমার পিতৃদেব সেইরূপ চমকাইয়া 'না না, উহা দেখাইব না' বলিয়া পুঁটুলিটি বুকে চাপিয়া ধরিলেন। পুঁটুলিতে কি ছিল পাঠকের বোধহয় জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। উহাতে ছিল তাঁহার গুরুদেবের পায়ের খড়ম ও উপবীত। অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে অষ্টাশী বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত কখনো কোনো দিন তিনি উহা নিজের কাছ ছাড়া করেন নাই যদি সরকারী কার্যোপলক্ষে কোনোদিন কোনো স্থানে রাত্রি কাটাইবার আবশ্যক হইত, উহা সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এইরূপ সত্তর বৎসর উহা বুকে করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রতিদিন প্রত্যুষে উহার পূজা করিতেন। এবং সেই সঙ্গে সন্ধ্যা-আহ্নিক-জপ ইত্যাদি করিতেন। পরে মৃত্যু-শয্যায় উহা ত্যাগ করিয়া আমাদের বলিলেন; 'উহাতে আমার গুরুদেবের খড়ম ও উপবীত আছে। দীক্ষার পর তিনি গলা হইতে উপবীত ও আমার প্রার্থনানুসারে তাঁহার পায়ের খড়ম দিয়াছিলেন।' পিতৃদেব কখনো তাঁহার গুরুদেবের কথা কহিতেন না। আজ পুঁটলি আমাদের দিয়া আদেশ করিলেন, 'উহাতে পাথর বাঁধিয়া অতলস্পর্শে নিক্ষেপ করিবে।' অতলস্পর্শ অনেক দূর, সেই সাগর সঙ্গমে। ততদূর যাইবার সুবিধা হইল না। হুগলীর নীচে ঘোলঘাট খুব গভীর ছিল, ঐ স্থানে পাথর বাঁধিয়া উহা নিক্ষেপ করা হইল। পিতা ঠাকুরের মৃত্যুর পর আমরা উহা খুলিয়া দেখিলাম, একজোড়া খড়ম, উহার 'বৌল' হাতির দাঁতের উহা এত বড় যে কলিযুগে মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী নহে; আর দেখিলাম উপবীত, সূতার প্রস্তুত নহে, আমার অগ্রজদের বিবেচনায় উহা কোনো গাছের ছাল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, তিব্বতদেশের গাছের ছাল; উহা তিন দণ্ডী। মধ্যস্থলে একটি গ্রন্থিদ্বারা আবদ্ধ। ঐ উপবীতের প্রত্যেক দণ্ডীর উভয় পিঠে কি লেখা ছিল; কি ভাষা বুঝা গেল না; বঙ্কিমচন্দ্রের বোধ হইল উহা তিব্বতী ভাষা। এই খড়ম ও উপবীত দেখিয়া বুঝা যায় যে, আমাদের পিতৃগুরু একজন সামান্য মানুষ অথবা বিভূতিমাখা সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিব্বতী পাহাড়ের একজন তাপস ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় দুইমাস পূর্বে একদিন রবিবারে গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইবার অভিপ্রায়ে তিনি ও আমি বাড়ি হইতে বহির্গত হইতেছি, এমন সময়ে এক ব্যক্তির সহিত বাড়ির সামনের গলিতে দেখা হইল। তাহার পরিধানে মালকোঁচা মারা গেরুয়া ধূতি, গায়ে গেরুয়া জামা, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়া হিন্দী ভাষায় বলিলেন, 'আপনি কি বঙ্কিমবাবু? আপনার সঙ্গে কথা আছে।' বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কে' কোথা

হইতে আসিয়াছেন?' তিনি উত্তর করিলেন, 'আমি তিব্বত হইতে আসিয়াছি। সেই স্থানের কোনও ব্যক্তি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।' বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, সেদেশের কোনো ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ নাই।' তিনি বলিলেন, আপনার নাই বটে, কিন্তু আপনার বাবার ছিল।' তখন বঙ্কিমচন্দ্র সম্মানের সহিত তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন; সদর মহলের তেতালার একটি নির্জন ঘরে (যে ঘরে বসিয়া তিনি লেখাপড়া করিতেন) প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, আমি দোতালায় বৈঠকখানায় বসিয়া রহিলাম। প্রায় রাত আটটার সময় দ্বার খুলিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ঐ ব্যক্তির সহিত কি কথোপকথন হইয়াছিল, এবং উনি কে?' কোনও উত্তর পাইলাম না। ইহার দুইমাস পরে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন।

আমার অগ্রজের ধারণা ছিল যে, তাঁহার গুরুদেবের সহিত পিতৃদেবের মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত, নতুবা যে ধর্মে তিনি ব্রতী ছিলেন, উহা কোথায় পাইলেন, যাহা হউক, পিতৃদেবের মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার গুরুদেব যে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃতুশয্যায় প্রলাপে ব্যক্ত হইয়াছিল।

জাতিপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র

দিলীপকুমার বিশ্বাস

('বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক ড. সত্যজিৎ চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

যতদূর জানা যায় আধুনিক অর্থে জাতি বা Nation এবং জাতীয়তাবাদ বা Nationalism-এর প্রত্যয়দ্বয় ও য়ুরোপের ইতিহাসে সেগুলির বাস্তবায়িত রূপের অভিব্যক্তিকাল মোটামুটি দ্বিতীয় পঞ্চদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। ফরাসী বিপ্লবরূপী অগ্ন্যুৎপাত এবং নেপোলিয়নের উত্থানপতনের পর য়ুরোপ যখন সাময়িকভাবে শান্ত হল তখনকার পরিস্থিতি বিচার করলে স্পষ্ট হয়, মুখ্যতঃ দুটি নূতন ভাবধারা সেখানে নবজাগ্রত ও নবসংগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিত্ত আলোড়িত করেছে এবং তার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রেরণাস্বরূপ সক্রিয় হয়েছে। এর একটি জাতীয়তাবাদ, অপরটি গণতন্ত্র। বস্তুতঃ জাতিপ্রতিষ্ঠার অদম্য প্রয়াস ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার অবিরত সংগ্রামই এক হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে য়ুরোপীয় ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও এই ধারা প্রবহমান ছিল। বলা যেতে পারে ফরাসী বিপ্লবের এ দুটি প্রত্যক্ষ ফল। কিঞ্চিৎ স্ববিরোধী শোনালেও একথা স্বীকার্য, নেপোলিয়নের স্বৈরাচারী শাসন পরোক্ষভাবে এই দুই নূতন আদর্শের সম্প্রসারণে পরোক্ষভাবে সহায়ক হয়েছিল।

কোনো জনসমষ্টির মধ্যে যখন একটি জাতিগত চেতনার উদ্ভব হয় তখন এই নূতন বোধকে বিশ্লেষণ করলে ইতিহাসে তার মূলে সচরাচর কয়েকটি বিশেষ উপাদানের একত্র সমাবেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এগুলি হল যথাক্রমে, ভৌগোলিক পরিধিগত ঐক্যবোধ; ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্যবোধ; জাতিসত্তার উৎপত্তিকাল সংক্রান্ত কোনো এক (ঐতিহাসিক, অর্ধ-ঐতিহাসিক বা বহুল পরিমাণে কল্পিত) ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্তি; কোনো এক কেন্দ্রীয়

শক্তি ও তার পরিকল্পিত ও প্রযুক্ত শাসনব্যবস্থার প্রতি স্বেচ্ছানুগত্য; অর্থনৈতিক স্বার্থ ও পরিকাঠামোর ভূমিতে সমদৃষ্টি ও সর্বোপরি অপরাপর জাতিসত্ত্বাবিশিষ্ট জনসমষ্টি থেকে একটি সামগ্রিক স্বাতন্ত্র্যবোধ। এই উপাদানগুলির একত্র সমাবেশ ও সমন্বয়ের ফলে নির্দিষ্ট জনমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমশঃ জাতিসত্তা স্ফুরিত হয় এবং তার ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ফলে কালক্রমে বিভিন্ন জাতির প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। একালে য়ুরোপের ইতিহাসে অন্ততঃ এমনটাই ঘটেছে। বর্তমানে 'জাতি' বা 'জাতীয়তাবাদ' শব্দ ব্যবহার করলে সচরাচর আধুনিক য়ুরোপীয় ইতিহাসে স্বীকৃত ও প্রচলিত সেগুলির এই অর্থই আমরা গ্রহণ করে থাকি।

উপরের সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গটি পূর্ণ করবার জন্য অতিরিক্ত দু'একটি কথা হয়তো বলা প্রয়োজন। জাতিসত্তার উল্লিখিত উপাদানগুলির মধ্যে সমান ঐতিহ্য-চেতনাকে গণ্য করা হয়েছে। এটি অল্পবিস্তর ভাবরাজ্যের বস্তু কিন্তু জাতিসত্তা বিকাশের প্রথম পর্বে এর শক্তিশালী ভূমিকা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ইতিহাস থেকে এর কিছু কিছু নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। আধুনিক ইতালীর জাতিগঠনের ইতিহাসে একসময় যথেষ্ট প্রেরণা সঞ্চার করেছিল Etruia-র প্রাক্-রোমক ভাষা ও সংস্কৃতি যার গুরুত্বের প্রতি সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ভিকো (১৬৬৮-১৭৪৪)। ফরাসীরা ছিল প্রাচীন গল (Gaul) এর বিজেতা ফ্রাঙ্ক-গোষ্ঠীর কীর্তিতে প্রচণ্ড উদ্দীপিত; আইয়ার বা আয়র্ল্যান্ডের অধিবাসীদের প্রাচীন কেল্টীয় রাজকাহিনী ও কেল্টীয় সন্তদের উপাখ্যানের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল; একালের আইরিশ শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণের সৃষ্ট Celtic Renaissance-আয়ার্ল্যান্ডের জাতীয় আন্দোলনে শক্তি ও প্রেরণা জুগিয়েছে একথা সর্বজনবিদিত; জার্মান জাতীয়তাবাদের প্রাচীন নিউটন পূর্বপুরুষদের বীরত্ব, স্বাধীনতাস্পৃহা ও (কল্পিত) রক্তবিশুদ্ধির সংস্কার প্রবল অনুপ্রেরণার উৎস; প্রাচীন পিকট (Pict) গোষ্ঠীর ঐতিহ্য বাস্তব ইতিহাসে কিছু অস্পষ্ট কিন্তু রূপকথার রাজ্যে যথেষ্ট সজীব; তবু স্কটল্যান্ডের স্বতন্ত্র ইতিহাসে বহু জাতীয় কীর্তির তা প্রেরণাস্থল; ইংল্যান্ডের প্রতিষ্ঠিত জাতিসত্তা নানা উপাদানের সম্পূর্ণ সংমিশ্রণে এমন মিলিতভাবে নির্মিত যে সেখানে একটি কোনো স্বতন্ত্র ঐতিহ্যস্মৃতিকে আলাদা করা কঠিন; কিন্তু তার অন্তর্গত ওয়েলস ও স্কটল্যান্ডে এই ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্র্যবোধের উপস্থিতি আজও উপেক্ষণীয় নয়। এই দৃষ্টান্তগুলিই প্রমাণ করে আধুনিক জাতীয়তাবাদের বিকাশে সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্যানুরক্তি (ইতিহাসভিত্তিক হোক বা কাল্পনিক হোক) জাতীয় ঐক্যবোধের গঠনে এক বিশেষ শক্তিশালী ফলপ্রসূ সংস্কাররূপে ইতিহাসে কতখানি কার্যকরী হয়েছে।

এ ছাড়া আধুনিক জাতিগঠন ও জাতীয়তাবাদের বিচারে আর একটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ সচেতন থাকা প্রয়োজন। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা মানুষের দেহগঠনের জীব বিজ্ঞানসম্মত কয়েকটি লক্ষণের ভিত্তিতে এক প্রকার লোকবিভাগ করেন যার নাম ইংরেজি ভাষায় দেওয়া হয়েছে 'race'। বাংলায় এর উপযুক্ত প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এমন-কি মূল ইংরেজি শব্দটির তাৎপর্য সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরাই সর্বত্র সহমত নন। বাংলায় 'জাতি', 'বর্ণ', 'কুল', 'গোষ্ঠী', প্রমুখ নানা শব্দ এই race বোঝাবার জন্য নানা সময়ে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে মূল প্রত্যয়টির

অর্থব্যঞ্জনার অস্পষ্টতা বেড়েছে মাত্র। তবে যে দেহলক্ষণগুলি এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি সেগুলি সুনির্দিষ্ট, যথা – ১. কেশের ন্যূনাধিক্য, গঠন ও বর্ণ; ২. গাত্রবর্ণ, ৩. চক্ষুতারকার রং ও চক্ষুর গঠন; ৪. উচ্চতা; ৫. করোটির গঠন; ৬. নাসার গঠন; ৭. সাধারণ শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য; ৮. রক্তশ্রেণী। এই লক্ষণগুলির বিচার-বিশ্লেষণের ফলে আদিম মানবসমাজের যেসব লোকবিভাগ নির্ণীত হয়েছে, মানব-ইতিহাসের সূচনাপর্ব থেকেই সেগুলির মধ্যে এক অবিরাম মিশ্রণক্রিয়া কার্যকরী হওয়ার ফলে প্রতিনিয়ত দেহমনের অসংখ্য রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সভ্যতা অগ্রসর হয়েছে। তাই বর্তমান যুগের জাতিসত্তার উদ্ভব ও জাতিপ্রতিষ্ঠার বিচারে এই 'race' প্রত্যয়ের উল্লেখযোগ্য প্রাসঙ্গিকতা কোনোভাবেই নেই। আদিম দেহলক্ষণযুক্ত যেসব গোষ্ঠীকে বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত বিশ্বের নানাপ্রান্তে বিভিন্ন আদিম race-এর প্রতিভূ (racial type) হিসাবে চিহ্নিত করেন তারা সচরাচর সভ্যতার অগ্রগতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; যাদের আচার-ব্যবহার, ধর্মবিশ্বাস, ভাষা, রূপকথা প্রভৃতি সংস্কৃতিবিজ্ঞানীদের (Cultural Anthropologist) আলোচনার বস্তু। এদের মধ্যে যে অংশ দেহগতভাবে বৃহত্তর জনসমষ্টির সঙ্গে কালক্রমে মিশে গেছে আধুনিক জাতিগঠনের ইতিহাসে তাদের কোনো স্বতন্ত্র ভূমিকা নেই। ইতালীয় দার্শনিক শিল্পতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদ বেনিদেত্তো ক্রোচের (১৮৬৬-১৯৫২) ভাষায়ঃ "...nation is a spiritual and historical concept and therefore in the act of becoming, not a naturalistic concept like a race"। য়ুরোপীয় সভ্যতার অবিমিশ্র 'race'-এর প্রভাব সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়ে ঐতিহাসিক ফিশার এ বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলেছেনঃ "Purity of race does not exist. Europe is a continent of energetic mongrels"।

বঙ্গীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর চিত্তজাগরণের প্রতিনিধিস্থানীয় মনীষীগণের–যাঁদের অগ্রগণ্যদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অন্যতম, দেশজিজ্ঞাসা ও তৎসংক্রান্ত জাতীয়তাবাদ বিষয়ক ভাবনা ছিল বহুলাংশে সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত। সুতরাং বঙ্কিমের জাতিসত্তাপ্রত্যয় ও জাতিপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে আধুনিক য়ুরোপের ইতিহাস থেকে আহরিত এই প্রেক্ষাপটটিকে মনে রাখতেই হবে।

য়ুরোপীয় রেনেশাঁসোত্তর মানবকেন্দ্রিক ও সামগ্রিক জীবনবোধ এবং পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্য ও বিশেষতঃ এদেশে তৎকালাবধি প্রায় অচর্চিত ইতিহাস বিদ্যার প্রভাব, ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবী মানসে যে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল তার একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। নূতন চিন্তার সংঘাতের ফলে কিন্তু স্বদেশের সুপ্রাচীন পরম্পরাগত ঋদ্ধিবান সভ্যতার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলির সঙ্গে তাঁদের মনের কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যবধান সৃষ্টি হয়নি বা এর প্রতি শ্রদ্ধারও কোনো অভাব ঘটে নি। ('ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর আচরণের সাময়িক ভারসাম্যহীনতা চিত্তস্ফূর্তির ক্ষণস্থায়ী আতিশয্যমাত্র)। এই শ্রদ্ধা আগাগোড়া মার্জিত হয়েছিল তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল বিচারবুদ্ধির দ্বারা। নবলব্ধ জ্ঞানের আলোকে চিরন্তন নিজস্ব ঐতিহ্যকে পরীক্ষানিরীক্ষা করে সমুচিত গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুগোচিত

এক সামগ্রিক জীবনবীক্ষার সূচনা করাই ছিল এঁদের লক্ষ্য। নিজেদের মধ্যে নানা ব্যাপারে মতভেদ সত্ত্বেও চিন্তাপদ্ধতিগত এই সাধারণ ভূমিতে তাঁরা ছিলেন এক। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনীষীদের পশ্চিমাগত ঐতিহাসিক দৃষ্টিপ্রসূত দেশবীক্ষা ও জাতিগঠন-প্রচেষ্টা এই নূতন জীবনবোধেরই একটি দিক। বঙ্কিমচন্দ্র কতকটা আপন চিত্তপ্রবণতার জন্যও বটে এবং অন্যান্য কিছু পারিপার্শ্বিক কারণেও বটে মুখ্যতঃ এ বিষয়ে তত্ত্বালোচনাতেই নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিলেন। বাংলায় তাঁর কালে ভারতীয় জাতিগঠনকে ত্বরান্বিত করবার উদ্দেশ্যে যে বহুবিধ কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছিল, যেমন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোশিয়েশন, ইন্ডিয়া লীগ, ভারতসভা বা ইন্ডিয়ান এসোশিয়েশন, জাতীয় কংগ্রেস ইত্যাদি,—এগুলির কোনোটির সঙ্গেই তিনি প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসেন নি, যদিও হয়তো এদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অভাব ছিল না। কিন্তু বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তিনি এই ক্ষেত্রে যে জ্ঞানদীপ্ত আলোচনা করেছেন – কোনো কোনো বিষয়ে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও আজ পর্যন্ত তার অপরিসীম মূল্য অবশ্যস্বীকার্য। তাত্ত্বিক আলোচনাতেই ছিল তাঁর আনন্দ, সেই ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার বিশেষ স্ফূরণ ঘটেছে। দার্শনিক পরিভাষায় এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগী, জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়বাদী নন।

রেনেশাঁসোত্তর য়ুরোপীয় ইতিহাসের নিষ্ঠাবান্ পাঠক হিসাবে বঙ্কিমের স্বদেশ-জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক কারণেই পাশ্চাত্ত্য জাতিসত্তার গঠন ও নব্য জাতীয়তাবাদের স্বীকৃত লক্ষণগুলি ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্বেষণ করতে প্রণোদিত হয়েছিল এবং আবিষ্কার না করতে পেরে যথেষ্ট হতাশ হয়েছিল। এই হতাশা বঙ্কিম গোপন রাখেন নি। প্রমাণস্বরূপ তাঁর 'ভারত-কলঙ্ক; ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?' (*বিবিধ প্রবন্ধ*, প্রথম ভাগ) শীর্ষক নিবন্ধের নিম্নাংশ উদ্ধৃত করা যায়,

"এই ভারতবর্ষে নানা জাতি।... বাঙ্গালি, পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাতপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্ম্মগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই, ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই। রাজপুত জাঠ এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলে, ভিন্নবংশীয় বলিয়া ভিন্ন জাতি; বাঙ্গালি, বেহারী একবংশীয় হইলে ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি; মৈথিলি, কনোজী একভাষী হইলে নিবাসভেদে ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট, যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক সর্ব্বাংশে এক, যাহাদের এক ধর্ম্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাঁহাদের মধ্যেও জাতির একতাজ্ঞান নাই। বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গালি-জাতির একতাবোধ নাই, শীকের (*sic*) মধ্যে শীক জাতির একতাবোধ নাই। ... বহুকাল পর্যন্ত বহু সংখ্যক ভিন্নজাতি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ পাইতে থাকে। ... তাহাদিগের পার্থক্য যায়, অথচ ঐক্য জন্মে না।... জাতিপ্রতিষ্ঠা নানা কারণে ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে লোপ হইয়াছে। লোপ হইয়াছে বলিয়া কখন হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক কোন জাতীয় কার্য্য সমাধা হয় নাই। লোপ হইয়াছে বলিয়া সকল জাতীয় রাজাই হিন্দুরাজ্যে বিনা বিবাদে সমাজ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হয়েছেন। এই জন্যই স্বাতন্ত্র্যরক্ষার কারণ হিন্দুসমাজ কখন তর্জ্জনীর বিক্ষেপও করে নাই।"

প্রথম দৃষ্টিতে এখানে 'জাতি' শব্দটির প্রয়োগ একটু শিথিল আর অস্পষ্ট মনে হবে। সমগ্র ভারতবর্ষে জাতিসত্তার যে লক্ষণগুলি বঙ্কিমের অন্বেষণের বস্তু, 'ধর্ম', 'ভাষা', 'নিবাস', 'বংশ' প্রভৃতি উল্লিখিত লোকসমষ্টিগুলির কোনোটির মধ্যেই সেগুলি একত্র সমাবিষ্ট হয়নি। যদি এগুলির অল্প দু-একটির দ্বারা গঠিত জনসমষ্টিকে পারস্পরিক প্রভেদ সত্ত্বেও এক-একটি স্বতন্ত্র 'জাতি' রূপে নির্দিষ্ট করতে হয় তাহলে সমগ্র ভারতবর্ষে যে অসংখ্য প্রতিষ্ঠিত 'জাতি'র অধিষ্ঠান তা স্বীকার করতেই হয় এবং উল্লিখিত অংশের প্রথম বাক্যেই তা স্বীকৃত। কিন্তু জাতি প্রতিষ্ঠাখ্য প্রত্যয়কে বঙ্কিম এই সঙ্কীর্ণ অর্থে কখনোই যে গ্রহণ করেন নি তা তাঁর রচনা পাঠ করলে পরিষ্কার বোঝা যায়। বঙ্কিমের বক্তব্য এই সব আঞ্চলিক ভাষা-বংশ-ধর্মভিত্তিক ও তৎসংক্রান্ত খণ্ড গোষ্ঠীচেতনার অস্তিত্ব সমগ্র ভারতবর্ষে একটি ঐক্যবোধ ও অখণ্ড জাতিচেতনার অভ্যুত্থানের পথে ইতিহাসে চিরদিন প্রতিবন্ধক-স্বরূপ হয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে একটি অখণ্ড জাতিসত্তার কল্পনা ভারতবাসীর চিত্তকে কখনো অধিকার করেনি। ইতিহাসের মাত্র দুটি পর্বকে তিনি এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম গণ্য করেছেন, শিবাজীর অধীনে মহারাষ্ট্রশক্তির জাগরণ ও রণজিত সিংহের অধীনে পঞ্জাবে শিখরাষ্ট্রের অভ্যুত্থান। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তদ্বয়ের যথার্থ্য যদি স্বীকার করাও যায় তাহলেও একথা বলতেই হবে সমগ্র ভারত-ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই দুই পর্ব এত ক্ষণস্থায়ী যে এর দ্বারা ভারতবর্ষ সমগ্রভাবে জাতিপ্রতিষ্ঠার পথে বিন্দুমাত্র অগ্রসর হতে পারেনি। বঙ্কিম-রচনার যে অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে বর্তমান প্রসঙ্গের উপস্থাপনা করা হয়েছে সেখানে 'জাতি' শব্দটি এই ভাবে সংকীর্ণ ও প্রশস্ত দুই অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তার মধ্যে ব্যাপক ও সর্বভারতীয় অর্থই বঙ্কিমের অভিপ্রেত। শব্দটির এই জাতীয় অসাবধান প্রয়োগ বঙ্কিম অন্যত্র করেছেন কদাচিৎ। *বিবিধ প্রবন্ধ*, দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" নিবন্ধের প্রথম প্রস্তাবে, ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের গোষ্ঠী-নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের 'জাতিবিৎ পণ্ডিত' আখ্যা দিয়েছেন। এখানে 'জাতি' শব্দ পূর্বকথিত নির্দিষ্ট-দেহলক্ষণযুক্ত আদিম নৃগোষ্ঠী বা race অর্থেই প্রযুক্ত। উক্ত নিবন্ধের দ্বিতীয় প্রস্তাবে এক স্থানে 'বর্ণ' ও 'জাতি' শব্দদ্বয় একই অর্থে গৃহীত। তা ছাড়া ভারতে আগত আর্যভাষী গোষ্ঠী বঙ্কিম রচনায় প্রায় সর্বত্র 'জাতি' নামে উল্লিখিত। এতে একটু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে কেননা সে সময়ে ম্যাক্স মুলারের প্রভাবে বেশ কিছু কাল 'আর্য' শব্দটির race অর্থ প্রচলিত ছিল। ম্যাক্স মুলার নিজেই উত্তরকালে সে মত পরিত্যাগ করেন। 'আর্য' শব্দের বিজ্ঞানসম্মত তাৎপর্য – একটি বিশেষ ভাষাভাষী গোষ্ঠী। 'জাতি' শব্দের এরকম কিছু অস্পষ্ট ও অসতর্ক প্রয়োগ সত্ত্বেও জাতি প্রতিষ্ঠাতত্ত্বের আলোচনাকালে বঙ্কিম যে সর্বত্র 'জাতি' শব্দে পাশ্চাত্ত্য অর্থে nation বুঝেছেন এ বিষয়ে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই। একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে তাহলে দুটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের সামনে আসছে—যার অভাব ভারতীয় জাতিসত্তার অন্বেষণে বঙ্কিম বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার অন্তর্নিহিত কোনো মৌলিক ঐক্যবোধের ভিত্তিভূমি তিনি খুঁজে পাননি

এবং খুঁজে পাননি দেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে জাতিপ্রতিষ্ঠার সামান্য সদর্থক প্রচেষ্টার কোনো নিদর্শন, তাঁর উল্লিখিত স্বল্পকাল-স্থায়ী পর্বে দুই শক্তিশালী শাসকের ব্যক্তিগত উদ্যম ছাড়া। প্রত্যয় দুটির পারস্পরিক সম্পর্ক অতি নিবিড় হলেও দুটি কিন্তু এক নয়। অখণ্ড আভ্যন্তর ঐক্য-চেতনা জাতিসত্তা-গঠনের নানা উপাদানের মধ্যে অতিগুরুত্বপূর্ণ অন্যতম, কিন্তু জাতিসত্তার একমাত্র ভিত্তি নয়।

সভ্যতার ঐক্যবোধ বলতে যদি অখণ্ড ভারত-চেতনা বোঝায় তা ভারতসংস্কৃতিতে দীর্ঘকাল ধরেই ছিল। অনুসন্ধান করলে দেখা যায় এই চেতনা তিনটি আধার আশ্রয় করে অভিব্যক্ত হয়েছে। প্রথমটি হল দেশের ভৌগোলিক পরিধিগত অখন্ডত্ব-চেতনা। ঋগ্‌বেদের কাল থেকে না হলেও পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকেই সমগ্র দেশখণ্ডের বিস্তার সম্পর্কে একটি বাস্তব ধারণা লোকচিত্তে গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। কবি কল্পনায় ভারতবর্ষকে তুলনা করা হচ্ছে সকোরক এক চতুর্দল পদ্মের সঙ্গে যার কোরক বা কেন্দ্রবিন্দু হল 'ধ্রুবা মধ্যমা দিশ্' বা পরবর্তী পৌরাণিক সাহিত্যের 'মধ্যদেশ'; উত্তরভাগ হল 'উদীচী দিশ্' বা 'উত্তরাপথ', পশ্চিমভাগ 'প্রতীচী দিশ' বা 'অপরান্ত'; পূর্বভাগ 'প্রাচী দিশ্' বা 'প্রাচ্য'; এবং দক্ষিণ ভাগ 'দক্ষিণা দিশ্' যেটির উত্তরার্ধের নাম কিছুকালের পরে হয়েছিল 'দাক্ষিণাত্য' ও নিম্নার্ধ বা সুদূর দক্ষিণ অঞ্চল চিহ্নিত হয়েছিল 'তামিলকম্' নামে। তখনো এইসব অঞ্চল সম্পর্কে ধারণা সর্বত্র হয়তো খুঁটিনাটির ব্যাপারে খুব স্পষ্ট নয় কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটা সমগ্রের। দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা সম্পর্কে এই বোধ আরও স্পষ্ট আর জোরালো হয়েছে পৌরাণিক যুগে অখণ্ড ভূভাগের একটি নাম পরিকল্পনার মাধ্যমে। ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে এই নাম 'ভারতবর্ষ'; বৌদ্ধ সাহিত্যে ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ঐতিহ্য থেকে ধার করে এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে 'জম্বুদ্বীপ'। মৌর্যসম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল প্রায় সর্বভারতীয় (সুদূর দক্ষিণের অল্প কিছু অংশ ছাড়া ...)। অশোক (খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী) তাঁর শিলালেখে নিজ-রাজ্যকে এই 'জম্বুদ্বীপ' নামেই উল্লেখ করেছেন। ভৌগোলিক অর্থে উক্ত নামদ্বয় সমগ্র দেশবাচক। 'ভারতবর্ষ' নাম সম্পর্কে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোদ্বৃত পুরাণ বচনগুলির দেশবর্ণনায়ঃ

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।।

বিষ্ণুপুরাণ, ২.৩.১।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমবদ্দক্ষিণং চ যৎ।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম যত্রেয়ং ভারতী প্রজা।।

বায়ুপুরাণ, ৪৫, ৭৫-৭৬।

দক্ষিণাপরতো যস্য পূর্বেন চ মহোদধিঃ।
হিমবানুত্তরেণাস্য কার্মুকস্য যথা গুণঃ।।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৫৭, ৫৮।

দেখা যাচ্ছে বর্ণনাটি আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন নয়। সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত এবং পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে সমুদ্র বেষ্টিত ও উত্তরে হিমালয় সীমিত ভূখণ্ডের নাম ভারতবর্ষ—এই প্রত্যয়টি পৌরাণিক সাহিত্যে গানের ধুয়ার মতোই একাধিকবার আবর্তিত হয়েছে। এই পৌরাণিক বর্ণনার মধ্যে আর-একটি বিষয়ও বিশেষভাবে লক্ষ করবার। এই ভারতবর্ষের অধিবাসীরা কিংবদন্তীখ্যাত রাজা ভরতের বংশধর প্রথম দুটি বচনে তা খোলাখুলিভাবেই উক্ত। সুতরাং সমগ্র ভারতবর্ষের জনসাধারণ যে একই কূলগত ঐতিহ্যের অধিকারী এ বিষয়ে পুরাণকারের ইঙ্গিত গোপন নেই। দেশগত ও ঐতিহ্যগত ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় সভ্যতায় যে ধর্ম, কর্ম, বর্ণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নানা বৈচিত্র্যের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ঘটেছে তারও একটি সহজ ও সুস্থ স্বীকৃতি পৌরাণিক সাহিত্যে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে, যেমন,

ভারতেষু স্ত্রিয়ঃ পুংসো নানাবর্ণাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
নানাদেবার্চনে যুক্তা নানকর্মানি কুর্বতঃ।।

কূর্মপুরাণ, ১, ৪৬, ২৯।

উল্লেখ্য 'ভারতবর্ষ' অভিধাটি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে উৎকীর্ণ কলিঙ্গরাজ খারবেলের *শিলালেখে*ও পাওয়া যায় – যদিও লিপিটি কালবশে অতি স্পষ্ট নয়। মধ্যযুগ থেকে ক্রমশঃ সমগ্র দেশবাচক অর্থে চালু হয়ে উঠেছিল। ভারতের ভৌগলিক পরিধিগত এবং ঐতিহ্যগত ঐক্য চেতনা সংক্রান্ত প্রাচীন সাহিত্যের সাক্ষ্য এবং সমগ্র দেশখণ্ডের জন্য একটি বস্তুভিত্তিক নাম পরিকল্পনা প্রসঙ্গ শেষ করবার পূর্বে সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন, অন্তত মৌর্যশাসনের আরম্ভকালে (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ থেকে) গ্রিক পর্যটকগণের সাক্ষ্যে সমগ্র ভারতবর্ষের চতুঃসীমান্তের দৈর্ঘ্যজ্ঞাপক যে পরিমাপ বর্ণিত হয়েছে তা সেকালের পক্ষে আশ্চর্যরকম নিখুঁত। আধুনিক জরিপে প্রাপ্ত হিসাবের সঙ্গে তার গরমিল অতি সামান্য। একথা সহজেই অনুমেয় দৌত্যকার্যে মৌর্যরাজধানী পাটলীপুত্রে অধিষ্ঠিত গ্রিকরাজদূতের কার্যালয় মৌর্যশাসনের জরিপ বিভাগ থেকেই এই পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছিলেন। বোঝা যায় প্রাচীন ভারতবর্ষে দেশের ভৌগলিক পরিধিগত ঐক্যচেতনা সর্বদা কবি-কল্পনা নির্ভর ছিল না। এর মূলে বাস্তব তথ্যজ্ঞানও খানিকটা কার্যকর হয়েছে।

ঐক্যবোধের দ্বিতীয় ধারাটিকে মোটামুটি নাম দেওয়া যেতে পারে রাষ্ট্রীয় ঐক্যচেতনা। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে এই প্রত্যয়টিকে বিচার করা একটু কঠিন। কেন-না নিছক তত্ত্বের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে যদিও প্রাচীন সাহিত্যে আলোচনার প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয় বাস্তব ইতিহাসে প্রাচীন ও মধ্যযুগে আসমুদ্র হিমাচল এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন রূপায়িত হয়েছে খুব অল্পকালের জন্য। ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন পর্বে নন্দবংশের মহাপদ্ম, মৌর্যবংশের চন্দ্রগুপ্ত থেকে অশোক ও গুপ্তবংশীয় কয়েকজন নরপতি এই কল্পনাকে বাস্তব রূপদানের প্রয়াস পেয়েছিলেন, কিন্তু স্থায়ী ফললাভ করতে পারেন নি। মধ্যযুগে আলাউদ্দীন খলজি থেকে

ঔরংজিব পর্যন্ত দিল্লীর সম্রাটগণের উত্তর ভারতীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে দক্ষিণ অঞ্চলকে যুক্ত করবার উদ্যমের মধ্যেও ছিল এক সর্বভারতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। কিন্তু খল্‌জি-তুঘলক পর্বে অত্যল্প কাল ও ঔরংজিবের রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসর ভিন্ন এ স্বপ্নের সাফল্য কোথায়? অপরপক্ষে ঋগ্বেদের আঞ্চলিক গোষ্ঠীরাষ্ট্রগুলির কথা বাদ দিলে পরবর্তী বৈদিকযুগ (আরম্ভকাল আঃ ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) থেকেই চিন্তার ক্ষেত্রে বৃহত্তর রাষ্ট্রের কল্পনা দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল। এর প্রমাণ "রাজা বিশ্বজনীনঃ", "রাজা সার্বভৌমঃ" "একরাট্" প্রভৃতি রাজশক্তির ক্রমবর্ধমান শক্তি-ব্যঞ্জক বিরুদের উদভাবন এবং "রাজসূয়", "অশ্বমেধ" "বাজপেয়" প্রভৃতি যজ্ঞবিধির উৎপত্তিতে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সুপরিকল্পিতভাবে ভারতের পাঁচটি অঞ্চলের জন্য শাসকগণের পাঁচরকম অভিধা নিরূপিত হয়েছে—মধ্যাঞ্চলের জন্য 'রাজা' প্রাচ্যের জন্য 'সম্রাট', প্রতীচ্যের জন্য "স্বরাট", উত্তরের জন্য 'বিরাট' ও দক্ষিণের জন্য 'ভোজ'। এর মধ্যে 'সম্রাট' আখ্যাটির তাৎপর্য লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে কৌটিল্য কল্পনা করেছেন, হিমালয় থেকে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণ বিস্তীর্ণ ও তির্যকভাবে সহস্র যোজন পূর্ব-পশ্চিম বিস্তীর্ণ (অর্থাৎ আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষ) চক্রবর্তীক্ষেত্র বা একচ্ছত্র চক্রবর্তী সম্রাটের শাসনক্ষেত্র নামে অভিহিত হবার যোগ্য। নবম-দশম শতাব্দীর নাট্যকার ও আলঙ্কারিক রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা-তেও চক্রবর্তীক্ষেত্রের প্রায় একই সংজ্ঞা পাওয়া যায়—কুমারিকা অন্তরীপ থেকে উত্তরে হিমালয়ের বিন্দু সরোবর পর্যন্ত সহস্রযোজনব্যাপী ভূখণ্ডের নাম চক্রবর্তীক্ষেত্র। বৌদ্ধ সাহিত্যেও সমগ্র জম্বুদ্বীপের অধিপতি 'চক্রবর্তী ধার্মিক ধর্মরাজের' বর্ণনা আছে যিনি অহিংসা নীতিদ্বারা মার্জিত ব্রাহ্মণ্য রাজনীতিশাস্ত্রোক্ত একচ্ছত্র চক্রবর্তী সম্রাটের প্রতিরূপ। কালক্রমে এই সর্বভারতীয় রাজশাসন-তান্ত্রিক-ঐক্যচেতনা বিশুদ্ধ বাচনিক সিদ্ধান্ত মাত্রে পরিণত হয়েছিল। সীমিতক্ষেত্রের অধিপতিদের অতিরঞ্জিত প্রশস্তিতে অনেক সময়ে নির্বিচারে চতুরুদধিমেখলা ধরণীর অধীশ্বর বলে অভিহিত করবার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। কিন্তু চক্রবর্তী সর্বভারতীয় সম্রাটের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত অধিক না থাকলেও আদর্শের ক্ষেত্রে অনুপূর্বিকভাবে ঐক্যের এই ধারণাটির উপস্থিতি ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় অবশ্য স্বীকার্য।

ঐক্যচেতনার তৃতীয় ধারাটিকে আমরা বলতে পারি সংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত ঐক্যবোধ। একে ইতিহাসে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। এর কারণ তার কোনো মূর্ত প্রকাশ সহসা চোখে পড়ে না। তাত্ত্বিক সংজ্ঞা দিতে গেলে এইটুকু বললে সম্ভবতঃ ঠিক হয়, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা লোকব্যবহার প্রভৃতি হিন্দু ভারতবাসীর জীবনের নানাক্ষেত্রে অসংখ্য বৈচিত্র্য, বিরোধ, এমন-কি ব্যবধানের অস্তিত্ব সত্ত্বেও সব কিছুকে ছাপিয়ে একটি আত্মিক ঐক্যভূমির অস্তিত্ব অনুভব করবার প্রবণতা। এই ভাবরূপী অন্তর্মুখী ঐক্যবোধ সর্বদা সচেতন স্তরের বস্তু নয়। অতি সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মনের অনুভূতিতে ভিন্ন তা সহজে ধরা পড়ে না। তার আভাস পাওয়া যায় কবির কল্পনায় বা সাধকের ধ্যানে। উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া যেতে পারে, সুপরিচিত সপ্ত-তীর্থবর্ণনা,

অযোধ্যা মথুরা মায়াকাশী কাজী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারবর্তী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ।।

অথবা অনুরূপ সপ্তনদীস্তুতি,

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধো কাবেরি-জলোস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।

ছত্রগুলির আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশের একটি ভাবমূর্তির যেন মনে উদয় হয়, অথচ সেটি নিছক ভৌগোলিক রূপ নয়। রাষ্ট্রীয় ঐক্যবঞ্জক রূপ তো নয়ই। ভারতবর্ষ এখানে যেন এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা অখণ্ড রাষ্ট্র অপেক্ষা অন্তরঙ্গতর কোনো সত্তা যাকে বলা যেতে পারে এক বিশিষ্ট সংস্কার; বস্তুর আশ্রয় ছেড়ে যা একটি ভাবসামান্যে রূপান্তরিত হয়েছে।

দেখা গেল জাতিসত্তাগঠনের পূর্বোল্লিখিত পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসে অধুনাস্বীকৃত লক্ষণগুলির মধ্যে ভৌগোলিক পরিধি-চেতনা, ঐতিহাসিক রূপায়ণের অভাবহেতু খণ্ডিত একরাষ্ট্র-কল্পনা ও হিন্দু মানসের সম্পূর্ণ ভাবরূপী এক সংস্কার ব্যতীত অন্যগুলি ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যে লক্ষণগুলি আংশিকভাবে চিহ্নিত করাও যায় সেগুলি ইতিহাসে এক সর্বভারতীয় জাতিসত্তাগঠনে বঙ্কিমের কাছে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলেই মনে হয়েছিল; কেন-না তিনি প্রথম থেকেই 'জাতিসত্তা' প্রত্যয়টিকে সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য অর্থে গ্রহণ করে জাতি বলতে য়ুরোপের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক nation বুঝেছিলেন। এই দৃষ্টিতে এক অপ্রতিদ্বন্দী কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতি আনুগত্য না থাকলে ইতিহাসে কোনো জনমণ্ডলীর জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা চূড়ান্ত হয় না। সপ্তদশ শতাব্দীতে শিবাজী ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রণজিৎ সিংহ ছাড়া বারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে প্রকৃত জাতি-সংস্থাপক পুরুষ আর তিনি দেখতে পাননি।

শিবাজী তাঁর সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিভা এবং সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি সমদৃষ্টির সাহায্যে সমগ্র মহারাষ্ট্রকে জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে প্রবল কেন্দ্রীয় মুঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধে এক আঞ্চলিক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। রণজিৎ সিংহ একইভাবে শিখ সম্প্রদায়কে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করে পঞ্জাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পত্তন করেছিলেন। বঙ্কিমের দৃষ্টিতে উক্ত দুটি আঞ্চলিক অভ্যুত্থানই প্রাক্-ব্রিটিশ ভারত-ইতিহাসে জাতি-প্রতিষ্ঠার অসফল প্রয়াস। দুটি প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল এবং সে জাতিসত্তা বাস্তবে আঞ্চলিকতাতেই নিবদ্ধ থেকেছিল, তার সর্বভারতীয় প্রসার সম্ভব হয়নি। শিবাজীর পর পেশোয়াদের হিন্দু-পাদ-পাদশাহী বা সর্বভারতীয় হিন্দু রাষ্ট্রীয় ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান এমন-কি বিভিন্ন হিন্দু রাষ্ট্র-শক্তিগুলিকেও মেলাতে ব্যর্থ হয়েছিল। শিখ রাজপুত প্রভৃতি সামরিক জাতিগুলিও এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেনি। তার উপর ছিল মহারাষ্ট্রীয় শক্তিপঞ্চকের নিরন্তর আত্মকলহ। তবে শিবাজী-কর্তৃক উদ্বুদ্ধ মারাঠী জাতীয়তাবাদ ও শিখ খালসা শক্তির অভ্যুত্থান আধুনিক ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে যে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল তার দুটি নিদর্শন আনন্দমোহন বসু সংস্থাপিত ছাত্র সমিতির সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের Rise of the Sikh Power শীর্ষক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা এবং টিলক পরিকল্পিত 'শিবাজী-উৎসব'-এর

অনুষ্ঠান বা শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর চিত্তেও সাময়িক ভাবে সাড়া জাগিয়েছিল। এক্ষেত্রে সমসাময়িক স্বদেশী নেতৃবৃন্দ বঙ্কিমের ভাবে ভাবুক ছিলেন। আশ্চর্য লাগে, এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিসাবে অশোক বা আকবরকে বঙ্কিমের মনে পড়েনি।

পাশ্চাত্যের শাসনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য জাতিপ্রতিষ্ঠার যে আদর্শ শিক্ষিত সমাজে সঞ্চারিত হয়েছিল তা কোন্ দিক দিয়ে ভারতবর্ষীয় জাতিগঠনে সর্বাধিক সহায়ক হতে পারে এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের স্পষ্টোক্তি পাওয়া যায় ঐ 'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধেই,

"ইংরেজ ভারতবর্ষের পরম উপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইয়াছে। যাহা আমরা জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখনো দেখি নাই বা শুনি নাই, বুঝি নাই তাহা দেখাইতেছে, বুঝাইতেছে, যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সে সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্ত ভাণ্ডার হইতে লাভ করিয়াছি তাহার মধ্যে দুইটি আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম – স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে হিন্দু জানিত না।"

এখানে একটি পাদটীকায় বঙ্কিম যে অর্থে 'জাতি' শব্দ গ্রহণ করেছেন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন: "এই প্রবন্ধে জাতি শব্দে nationality বা nation বুঝিতে হইবে।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত প্রগতিশীল বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের নব্য জাতীয়তাবাদে এই দৃষ্টিই মুখ্যতঃ প্রতিফলিত। এ হিসাবে বঙ্কিমকে বলা যেতে পারে স্বশ্রেণীর প্রতিনিধি এবং নব্য জাতীয়তামন্ত্রের তাত্ত্বিক। ইংরেজ শাসনের নানা শোষণ-পীড়ন সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত তখনকার মনীষীরা কেন যে তৎক্ষণাৎ এর উচ্ছেদ চাননি এটি তার অন্যতম প্রধান কারণ। রামমোহন একে বিধাতার শুভ বিধানরূপে স্বাগত জানিয়েছিলেন বঙ্কিমও এর দীর্ঘস্থায়িত্ব কামনা করেছিলেন। এরা আশা করেছিলেন ব্রিটিশ সংযোগের দ্বারা স্বদেশবাসীর মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের ও একজাতিত্ব প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে।

যে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা বঙ্কিমের মতে ইংরেজ আগমনের পূর্বে ভারতবাসীর অজ্ঞাত ছিল সে প্রসঙ্গ বিচারের পূর্বে তার আনুষঙ্গিক আর দু'একটি প্রত্যয়ের বিচার প্রয়োজন। "খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত" ভারতে যে একজাতি প্রতিষ্ঠার সমস্যা নিয়ে বঙ্কিম এত গভীর চিন্তা করেছিলেন তা তাঁর মানসে মুখ্যতঃ হিন্দু জাতীয়তা রূপেই প্রতিভাত হয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিতে ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে প্রধানতঃ বুঝিয়েছে হিন্দু সংস্কৃতি। হিন্দুরা বর্তমানে এক পরাজিত ও পরাধীন জাতি। কিন্তু এই পরাজয় ও পরাধীনতার পর্ব তাঁর দৃষ্টিতে শুরু হয়েছে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠার কাল থেকে নয়, তার সাত-আট শতাব্দী পূর্বেকার মুসলমান বিজয়ের সময় থেকে। সমগ্র মধ্যযুগেও ভারতবর্ষ এই অর্থে বিদেশীর পদানত ছিল। আধুনিক ইতিহাসদৃষ্টি স্বভাবতঃ এই কারণে তাঁর দেশচেতনা ও স্বাজাত্যবোধকে খণ্ডিত মনে করবে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা ভেবে দেখবার আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি-শিক্ষিত বর্ণ হিন্দুর মধ্যে যে চিত্তজাগরণ দেখা দিয়েছিল পাশ্চাত্য চিন্তালব্ধ নব্য জাতীয়তাতন্ত্রের এদেশে পুরোধা ছিল সেই শ্রেণী। উচ্চবর্ণ ও উচ্চশ্রেণীভুক্ত, এবং আজীবন সেই শ্রেণী-সংস্কারে লালিত হওয়ায়

স্বভাবতঃ শ্রেণী-মানসিকতা জীবনে কখনো সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন নি। যদিও চিন্তার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত আশ্চর্যভাবে শ্রেণীদৃষ্টিকে অতিক্রম করেছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। তৎকালীন শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের দেশচেতনার গঠন ছিল মুখ্যতঃ হিন্দু-সংস্কৃতি প্রভাবিত। শ্রেণী পরিবেশের পরে আসে পারিবারিক পরিবেশ। স্বধর্ম ও আচারনিষ্ঠ হিন্দু বৈষ্ণব পরিবারে বঙ্কিমের জন্ম, সেখানে কুলদেবতা রাধাবল্লভের নিত্য পূজা, সামাজিক আদান-প্রদানে স্মার্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সমস্ত আচার ত্রুটিহীন রূপে প্রতিপালিত। এর ব্যতিক্রম বঙ্কিমের ব্যক্তিজীবনেও কখনো ঘটেনি। পারিবারিক পরিবেশ এবং সংস্কারেও তাই বঙ্কিম আজীবন রয়ে গেলেন হিন্দু। সেই সময় মুখ্যতঃ বিদেশীয় বিদ্বানদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি আলোচনার ফলে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিসম্পদের নব নব অধ্যায় আবিষ্কৃত হতে থাকে। ইংরেজি ও সংস্কৃতে অসাধারণ অধিকার সম্পন্ন বঙ্কিমের পক্ষে তাই প্রাচীন হিন্দুর এইসব কীর্তির অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করবার পথ অনেক সহজ হয়েছিল এবং প্রাচীন ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কৃতি সম্পর্কে গৌরববোধ তাঁর দেশচেতনাকে স্বভাবতঃ উদ্দীপ্ত করেছিল। কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থে এ বিষয়ে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মনীষার নিদর্শন আছে। এখানে বক্তব্য, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নিষ্ঠাবান স্মার্ত ব্রাহ্মণের সামাজিক আচার মেনে চললেও ব্যক্তিগত জীবনচর্যায় ও বিশ্বাসে তিনি যাকে গোঁড়া হিন্দু বলে তা একেবারেই ছিলেন না। ''হিন্দুধর্ম মানি কিন্তু তার বখামিগুলা মানি না' – এই একটি উক্তির মধ্যেই তাঁর মনোভাবের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। দুটি দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে উপস্থাপিত করা যায়: ১। তিনি বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করেন নি (দ্রষ্টব্য: দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম, 'কোন পথে যাইতেছি'), ২। তিনি জন্মব্রাহ্মণের উপর গুণব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এ বিষয়ে ধর্মতত্ত্ব-এর একটি উক্তি আমাদের বিস্মিত করে,

''গুরু: যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক তাঁহাকে ভক্তি করি; যিনি তাহা নহেন তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত অর্থাৎ যিনি ধার্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক তাহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব।

শিষ্য: অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য। ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন?

গুরু: কেন করিব না? ঐ মহাত্মা সুব্রাহ্মণের গুণ সকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির পাত্র।

শিষ্য: আপনার এরূপ হিন্দুয়ানীতে কোন হিন্দু মত দিবে না।

গুরু: না দিক, কিন্তু ইহাই যথার্থ হিন্দুধর্ম।''

তাঁর সিদ্ধান্তের সপক্ষে মহাভারতের বনপর্ব থেকে ও বৃদ্ধগৌতমসংহিতা থেকে বচন উদ্ধৃত করে তিনি দেখিয়েছেন ব্রাহ্মণত্ব নির্ভর করে গুণের উপর, জন্মলগ্ন বর্ণের উপর নয় (ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ)। তা ছাড়া মানুষের সমস্ত বৃত্তিগুলি অনুশীলনের

মাধ্যমে সমানভাবে বিকশিত করবার যে মতবাদ তিনি তাঁর ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে প্রচার করেছিলেন তা ছিল হিন্দুধর্মকে সমস্ত সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে প্রায় এক বিশ্বজনীন ভূমিতে স্থাপন করবার প্রয়াসী, যেখানে অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে তার বিভেদ এবং বিবাদের সম্ভাবনা প্রায় লুপ্ত। অবশ্য একথাও ঠিক বঙ্কিম-ব্যাখ্যাত উদার হিন্দুধর্মের গুরুত্বপূর্ণ মৌল সংস্কারবর্জিত রূপ ভিন্ন-সংস্কারের লালিত কোনো অহিন্দুর পক্ষে সহসা উপলব্ধি এবং প্রচলিত হিন্দুধর্মের সঙ্গে তার পার্থক্য নির্ণয় করা সেযুগে সহজ ছিল না; বিশেষতঃ যেখানে সামাজিক আচারব্যবহারে বঙ্কিম কোথাও হিন্দু জীবনচর্যার কোনো বিধি লঙ্ঘন করেন নি। ভারতবর্ষীয় সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ বিচারের প্রশ্নে হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রাসঙ্গিকতা অবশ্যস্বীকার্য; তার মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের গুরুত্ব নিঃসংশয়ে সর্বাধিক। প্রায় সাতশো বৎসর ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন ছিল মুসলমান রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণে। এই পর্বে মুসলমান ও হিন্দু প্রতিবেশী রূপে বাস করেছে এবং হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতা বিভিন্ন সময়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সত্ত্বেও যে পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে তা ইতিহাসের সত্য – একে অস্বীকার বা উপেক্ষা করা যায় না। এ পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমের মতো উদার ইতিহাস-সচেতন মনীষীর জাতিতত্ত্ব বিচারের সর্বাংশে হিন্দুত্ব-চেতনা নির্ভরতা আমাদের মনে যে অভাববোধ সৃষ্টি করে তা যথার্থ। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিগত এই সমস্যাও বিচার্য, যে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভকাল থেকে হিন্দু মধ্যবিত্তের মনের মুক্তি ঘটিয়েছিল, ভারতের সমসাময়িক মুসলমান সমাজ তাকে তখন স্বাগত জানায় নি। তার চিত্তজাগরণ ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগঠন ঐতিহাসিক কারণেই শুরু হয়েছিল দেরীতে। সুতরাং আধুনিক প্রগতিশীল দৃষ্টিতে একটি অখণ্ড ভারতীয় জাতিসত্তা অনুভব ও তার বাস্তব রূপায়ণের প্রশ্নে সমকালীন অনেকাংশে পাশ্চাৎমুখী মুসলমানসমাজে আগ্রহের অভাব ছিল যথেষ্ট। সে তরফে অনুকূল মনোভাব স্বাভাবিক কারণেই তখন ছিল অপ্রত্যাশিত।

এই প্রসঙ্গে বাঙালী জাতীয়তা সংক্রান্ত বঙ্কিমের গভীর চিন্তার সংক্ষিপ্ত আলোচনারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। বস্তুতঃ ভারতীয় জাতীয়তা ও হিন্দু জাতীয়তার পাশাপাশি 'বাঙালী জাতীয়তা' সংক্রান্ত আলোচনা বঙ্কিমের সমগ্র জাতিতত্ত্বভাবনার অপর এক বৈশিষ্ট্য। বঙ্গদর্শন মাধ্যমে যেমন রসসাহিত্যে ও মননশীল সাহিত্যে বাঙালী তাঁর কাছে নূতন দীক্ষালাভ করেছিল, তেমনি এই পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালীকে তার নিজ ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন করবার জন্য তিনি বিশেষ প্রয়াসী হয়েছিলেন। বাংলার একখানিও প্রকৃত ইতিহাস তখন পর্যন্ত রচিত হয়নি এ বিষয়ে তাঁর গভীর মর্মবেদনা ছিল। এই কাজে তিনি শুধু প্রতিটি শিক্ষিত বাঙালীকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বয়ং অগ্রসর হয়েছিলেন। সেই প্রচেষ্টার ফল-স্বরূপ রচিত বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক তাঁর কয়েকটি নিবন্ধ বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে সংকলিত হয়েছে। ('বাঙালির বাহুবল'; 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব', 'বাঙ্গলার ইতিহাস, সম্বন্ধে কয়েকটি কথা,' 'বাঙ্গলার ইতিহাসের ভগ্নাংশ;' 'বাঙ্গালির উৎপত্তি' সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং 'বাঙ্গলার

কলঙ্ক'।) এইসব রচনার উদ্দেশ্য ছিল অতীত গৌরব স্মরণ করিয়ে বাঙালীকে তার নিজস্ব জাতিসত্তা সম্পর্কে সচেতন করা ও তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা। এর মধ্যে একটি নিবন্ধে ইতিহাস রচনায় বাঙালীর উদাসীনতা বিষয়ে তাঁর আক্ষেপ প্রায় তিক্ত আবেগে পরিণত হয়েছে,

"সাহেবরা যদি পাখী মারিতে যান তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়; কিন্তু বাঙ্গলার ইতিহাস নাই। গ্রীণলণ্ডের ইতিহাস আছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল সেখানে নৈষধ-চরিত, গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই।

মার্শমান, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি। সে কেবল সাধপূরাণ মাত্র।

ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম, এমন দুই একজন হতভাগ্য আছে, যে পিতৃ-পিতামহের নাম জানে না; এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে কীর্তিমন্ত পূর্বপরুষগণের কীর্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী।"

বঙ্কিমের জীবদ্দশায় তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রচেষ্টায় এই ইতিহাস রচনার প্রস্তুতিপর্বটুকু দেখে যেতে পেরেছিলেন মাত্র। এ বিষয়েও তাঁর মনে আক্ষেপ ছিল। এর প্রকাশ দেখা যায় 'বিবিধ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ'-এর বিজ্ঞাপনে,

"এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম বাঙ্গলার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া একখানি বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।...যেমন কুলিমজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ।...কিন্তু কৈ, আমি তো কুলি মজুরের কাজ করিয়াছি—এপথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমনবার্তা তো শুনিলাম না।"

বঙ্কিমের মৃত্যুর পর এ বিষয়ে তাঁর স্বপ্নসাধ পূর্ণ করেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এইভাবে বঙ্কিম বঙ্গচেতনায় স্বয়ং উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র বাঙালী জাতিকে তাঁর রচনামাধ্যমে উদ্দীপিত করে তুলেছেন। কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব'-এর আরাধ্যা জননী বঙ্গজননী রূপেই কল্পিতা; 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে মূলত: সপ্তকোটি কণ্ঠে তিনিই দেশজননীরূপে বন্দিতা। বাংলার অখণ্ড জাতিসত্তার অন্বেষণ ও সমগ্র বাঙালী শিক্ষিত সমাজের মর্মে তার প্রতিষ্ঠা বঙ্কিমের এক প্রধান কীর্তি। উত্তরকালের স্বদেশী আন্দোলনকে তা কি পরিমাণ প্রভাবিত করেছিল ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন বঙ্কিমের

এই আঞ্চলিক জাতীয় চেতনার সঙ্গে তাঁর অখণ্ড ভারত চেতনার কোনো মৌলিক বিরোধ ছিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ও ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এত তীব্রভাবে না হলেও ভবিষ্যৎমুখী আঞ্চলিক চেতনা তখন ভারতের অন্যান্য প্রান্তেও স্ফূরিত হতে আরম্ভ করেছিল। বাংলার নবজাগরণের নেতৃবৃন্দ এই বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য সর্বদা উৎসুক ও অগ্রসর ছিলেন। সমগ্র দেশের স্বার্থে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে জাতীয় আন্দোলনের উপযোগিতা সব প্রান্তের জাগ্রত মানুষই উপলব্ধি করেছিলেন। এই উদ্যম থেকেই ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি। বঙ্কিম স্বয়ং এই কর্মযজ্ঞের অংশভাগী না হলেও এর প্রয়োজনীয়তা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা' শীর্ষক নিবেদনে এ বিষয়ে তাঁর উক্তি খুব স্পষ্ট,

"এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত; সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী একোদ্যোগ না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়; কেননা এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে।"

এখানে একটি পাদটীকায় বঙ্কিম বলেছেন: "এখানে যাহা কথিত হইয়াছে কংগ্রস তাহা সিদ্ধ করিতেছেন।" দেখা যাচ্ছে, সর্বভারতীয় ঐক্যসাধনকে এখানে বঙ্কিম আঞ্চলিক জাতীয় স্বার্থের উপরে স্থান দিয়েছেন; তাঁর বঙ্গচেতনা কোনোক্রমেই সর্বভারতীয় চেতনার প্রতিবন্ধক নয়, পরিপূরক। সংকীর্ণ বাঙালী patriotism-এর থেকে জাত আলাদা। এই কারণেই মূলতঃ বঙ্গবন্দনারূপে রচিত 'বন্দে মাতরম' ভারতীয় জনচিত্তে অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই 'ভারত-বন্দনা' রূপে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করেছে। 'বন্দে মাতরম'- এর সঙ্গে 'বন্দে ভারতম্'-এর জনমন কোনো পার্থক্য দেখে নি।

যে স্বাতন্ত্র্যবোধ পাশ্চাত্য জাতিপ্রতিষ্ঠার একটি বিশিষ্ট উপাদানরূপে স্বীকৃত ইংরেজ আগমনের পূর্বে, বঙ্কিমের মতে, হিন্দু মানসিকতায় তার অস্তিত্ব ছিলনা। 'ভারত কলঙ্ক' ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?' শীর্ষক নিবন্ধে বঙ্কিম হিন্দুর এই স্বাতন্ত্র্যবোধের অভাবের নিম্নলিখিত কারণগুলি নির্দেশ করেছেন: হিন্দু স্বভাবতঃ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষারহিত; "পরতন্ত্রতা অপেক্ষা স্বতন্ত্রতা ভাল, এরূপ একটা বোধা তাহাদের থাকলে থাকিতে পারে– কিন্তু সেটি বোধ মাত্র–সে জ্ঞান আকাঙ্খায় পরিণত নহে।... প্রাচীন বা আধুনিক ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা বলবতী আকাঙ্খায় পরিণত। তাঁহাদিগের বিশ্বাস সে স্বতন্ত্রতা ত্যাগের অগ্রে প্রাণ এবং সর্বস্বত্যাগ কর্তব্য। হিন্দুদের মধ্যে তাহা নহে। যে ইচ্ছা রাজা হউক পরজাতীয় হউক সুশাসন করিলে দুই সমান। স্বজাতীয় রাজা সুশাসন করিলে পরজাতীয় সুশাসন করিবে না ইহার স্থিরতা কি?... তবে কেন স্বজাতীয় রাজার জন্য প্রাণ দিব? রাজ্য রাজার সম্পত্তি। তিনি রাখিতে পারেন রাখুন।"

জাতিকে নিজ প্রতিষ্ঠা পূর্ণ করতে হলে তার পক্ষে এ বিষয়ে দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন আবশ্যক। যদি তার জন্য কিছু পরিমাণে পরজাতিপীড়নের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রেও পশ্চাৎপদ হওয়া কর্তব্য নয়। জাতিপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ করতে হলে আগ্রাসী চিত্তবৃত্তিকে সদাজাগ্রত রাখতে হবে। তবে জাতিপ্রতিষ্ঠার জন্য জাতি বৈরের উপযোগিতা ও আবশ্যকতার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম এর দোষাবহ বিকারের ভয়াবহতা সম্বন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে ভোলেন নি এবং সাময়িক য়ুরোপীয় ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলেছেন, সেখানে এর আধিক্যহেতু বহু অকারণ যুদ্ধ ও রক্তপাত ঘটেছে। সুতরাং এমন বিকৃত মনোভাব কোনো জাতির পক্ষে পোষণ করা সর্বাংশে অনুচিত—"পরজাতির মঙ্গল মাত্রেই স্বজাতির অমঙ্গল, পরজাতির অমঙ্গল মাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল।" জাতিপ্রতিষ্ঠার এই অপরিহার্য উপাদান জাতিবৈর হিন্দুদের মধ্যে দীর্ঘকাল অদৃশ্য। ভারতবর্ষে আর্য-অভিযান এবং সমগ্র দেশে আর্য-অধিকার সম্প্রসারিত হওয়ার পরে হিন্দুদের মধ্যে ইতিহাসে মাত্র একবার জাতিপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়েছিল। তারপর ক্রমশঃ সমাজ নানা গোষ্ঠীর মিশ্রণের ফলে বিভিন্নভাবে বিভক্ত হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে খণ্ড খণ্ড নানা আঞ্চলিক জাতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রথম আর্য আমলের সেই একজাতিত্ব বর্তমানে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে না হলেও হিন্দু সমাজের সমকালীন অবস্থা সম্পর্কিত বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সমকালীন আর দুই বাঙালী মনীষীর সিদ্ধান্তের বাহ্যতঃ কিছু সাদৃশ্য আছে। রামমোহন ১৮২৮ সালে তাঁর এক বন্ধুকে হিন্দুসমাজের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে লেখেন,

"I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes introducing innumerable divisions and subdivisions among them has entirely deprived them from patriotic feeling and the multitudes of religious ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise".

রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ক মতামত প্রকাশিত হয়েছিল তার জাভাযাত্রীর পত্র সংকলনে,

"মানুষের মনঃপ্রকৃতির বিভিন্নতা স্বীকার করে নিয়ে হিন্দুধর্ম রফানিষ্পত্তি সূত্রে কত বিপরীত রকম রাজিনামা লিখে দিয়েছে তার ঠিকানা নেই। ভেদ নষ্ট করে ফেলে হিন্দুধর্ম ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করে নি ভেদ রক্ষা করেও সে একটা ঐক্য রক্ষা করেছে। কিন্তু এমন ঐক্য সহজ নয় বলেই এর মধ্যে দৃঢ় ঐক্যের শক্তি থাকে না। বিভিন্ন বহুকে স্বীকার করেও তার মাঝে মাঝে অলঙ্ঘনীয় দেওয়াল তুলে দিতে হয়। একে অবিচ্ছিন্ন এক বলা যায় না বলতে হয় বিভক্ত এক।" (রবীন্দ্র রচনাবলী—বিশ্বভারতী ১৯ খণ্ড পৃ. ৪৭৫)।

দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমের মতোই রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কালীন হিন্দুসমাজে কোনো ঐক্যের সন্ধান পাননি। দুজনেই তাঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে এর জন্য সমাজের অভ্যন্তরীণ জাতিবর্ণভেদকে দায়ী করেছেন। রামমোহনের উক্তি সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট; রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত হলেও ব্যঞ্জনায় গভীরতর। ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত

হবার আগে ও পরে অসংখ্য গোষ্ঠী প্রবেশ করেছে ও ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত হয়েছে। মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত এই আগন্তুক জনমণ্ডলী কালক্রমে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সমাজদেহে বিন্যস্ত হয়েছে নিজ নিজ ধর্ম ও সামাজিক সংস্কার সহ। বর্ণাশ্রম-শাসিতহিন্দু সমাজ আপত্তি করেনি—সমাজে বর্ণাশ্রম কাঠামোর মধ্যে এদের স্থান নির্দিষ্ট করে গণ্ডী কেটে দিয়েছে। কালক্রমে এদের মধ্যে অসংখ্য বিভাগ, উপরিভাগের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকটি তাদের স্বতন্ত্র ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার-পালনের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছে। এইটি ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় হিন্দু সমাজশাস্ত্রীদের লিখে দেওয়া 'রাজিনামা'। বিনিময়ে শর্ত ছিল একটিই—কিছুতেই গণ্ডীভাঙা চলবে না, বর্ণাশ্রমের কাঠামোটিকে যে-কোনো মূল্যে অটুট রাখতেই হবে। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন সমাজভুক্ত অসংখ্য গোষ্ঠীর মাঝে মাঝেই 'অলঙ্ঘনীয় দেওয়াল'। তাই হিন্দু সংস্কৃতিতে জাতীয় ঐক্যবোধের কয়েকটি মৌল উপাদান থাকলেও দৃঢ়ভিত্তিক জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা করেত ইতিহাসে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বঙ্কিম আর্যোত্তর যুগে ভারতে (বিভিন্ন ধারার মুসলমান গোষ্ঠী সমেত) অসংখ্য অন্য বহিরাগত জনমণ্ডলীর আগমন ও রাজ্যস্থাপন ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে স্বীকার করেছেন—কিন্তু মুসলমান ছাড়া অন্যান্য গোষ্ঠীসমূহের হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যাবার অভ্যন্তর প্রক্রিয়ার উপর তিনি গুরুত্ব অর্পণ করেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে এইসব বিদেশী অভিযান (মুসলমান অভিযানগুলি সমেত(আর্য-যুগে ভারতে যে জাতিপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়েছিল তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয় এবং *ফলে কালক্রমে যে জাতিসত্তাহীন বহুধাবিভক্ত ভারতের বর্ণনা দিয়ে তিনি তাঁর 'ভারতকলঙ্ক' আরম্ভ করেছেন ভারত সেই অবস্থায় উপনীত হয়।

এক্ষেত্রে বঙ্কিম এবং রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের দুই দৃষ্টিভঙ্গীর আপাত সাদৃশ্যের অন্তরালে যে প্রধান পার্থক্য চোখে পড়ে তা বর্তমান হিন্দুসমাজের গঠনকেন্দ্রিক। বঙ্কিমের মতে বৈদিক ও তার অব্যবহিত কালে আর্য সভ্যতায় যে জাতি প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়েছিল আর্যসভ্যতা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বার পর তা অন্তর্হিত হবার কারণ—এই বিস্তারের ফলে: ''ভারতবর্ষ...বহুসংখ্যক খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইল। সমাজভেদ ভাষার ভেদ আচার ব্যবহারের ভেদ নানাভেদ শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল। বাহ্লিক হইতে পৌন্ড্র পর্য্যন্ত কাশ্মীর হইতে চোলপাণ্ড্য পর্য্যন্ত মক্ষিকা সমাকুল মধুচক্রের ন্যায় নানা জাতি নানা সমাজে পরিপূর্ণ হইল।'' এর উপর খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবে গুরুতর ধর্মভেদ উপস্থিত হল। অখণ্ড হিন্দুজাতিসত্তার উপর শেষ আঘাত এল আগন্তুক বিদেশী শক্তিগুলির হাতে। এরই চূড়ান্ত অধ্যায় মুসলমান আক্রমণ ও ভারতে মুসলমান রাজ্যপ্রতিষ্ঠা। বঙ্কিমের রচনায় এমন ইঙ্গিত আছে, আদি বৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক কালের সমাজশিক্ষক ও সমাজনিয়ন্তা ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদর্শ বর্ণাশ্রমবিধি থেকে হিন্দু সমাজের বিচ্যুতিই বৈদিক যুগের জাতিপ্রতিষ্ঠা বিলোপের মূল কারণ,

''বৈদিক কালের এবং তার অব্যবহিত পরেই জাতিপ্রতিষ্ঠা যে আর্যগণের মধ্যে বিশেষ বলবতী ছিল। তাহার অনেক প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রাদির মধ্যে পাওয়া যায়। তৎকালীন সমাজনিয়ন্তা

ব্রাহ্মণেরা যেরূপ সমাজ বিধিবদ্ধ করিয়াছিল তাহাও ঐ জ্ঞানের পরিচয় স্বরূপ। আর্য্যবর্ণে এবং শূদ্রে যে বিষম বৈলক্ষণ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহাও ইহার ফল।"

ইতিহাসের দৃষ্টিতে একথা বলা অসঙ্গত হবেনা বর্ণাশ্রমের পরিকাঠামো এবং তদ্‌ভিত্তিক জাতিবিভাগের রূপরেখা ঋগ্‌বেদ-এর কালে না হোক তার অব্যবহিত পরবর্তী যজুর্বেদ-এর কালে সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। আর্যসভ্যতার বিস্তারের ফলে বর্ণাশ্রমের এলাকার মধ্যে নানা বৈচিত্র্যের আমদানী হয়েছিল বটে কিন্তু তার ফলে মূল সংগঠনটি বিপর্যস্ত হয়নি। অসংখ্য 'রাজিনামা'র সাহায্যে সেগুলি বর্ণাশ্রমের চৌহদ্দির মধ্যেই বর্ণাশ্রমের মর্যাদা রক্ষার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে বর্ণাশ্রমসৃষ্ট পারস্পরিক ভেদরক্ষার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে যথাস্থানে বিন্যস্ত হয়েছিল। দুঃখের বিষয় সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত হিন্দু সমাজব্যবস্থার ক্রমবিকাশের এই অভ্যন্তর প্রক্রিয়াটি বঙ্কিমের মতো তীক্ষ্ণধী পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এক সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে বহুর সমাবেশের স্থলে তিনি দেখেছিলেন এক ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে বিশৃঙ্খল পরস্পর বিচ্ছিন্ন বহুর অবস্থিতি। এই অবস্থাকে তিনি মনে করেছেন, বৈদিক যুগের জাতিপ্রতিষ্ঠার সার্থক প্রয়াসের এক শোচনীয় পরিণাম। বেদোত্তর কাল থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দুসমাজে ও সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে খণ্ডিত আঞ্চলিকতারই প্রকাশ, সর্বভারতীয় জাতিসত্তা বিকাশের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই বিচ্ছিন্নতার স্রোত প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে বঙ্কিমের কালে দেশ সেই হতশ্রী অবস্থায় পৌঁছেছে যার অনবদ্য বর্ণনা তিনি করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। মনে রাখতে হবে, এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম বৌদ্ধধর্মকেও জাতিসত্তার প্রতিবন্ধক শক্তির মধ্যে গণ্য করেছেন, কেন-না তাঁর বিবেচনায় বুদ্ধ তাঁর বেদবিরোধী ধর্মের দ্বারা দেশের ধর্মীয় ঐক্যে আঘাত করেছিলেন। বঙ্কিম-মনীষার প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রেখে বলতেই হয়, ইতিহাসের এমত ব্যাখ্যা স্বীকার করা একটু শক্ত। বেদপরবর্তীযুগেও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নব নব অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, আধ্যাত্মিক চিন্তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের (অথবা বঙ্কিমের ভাষায় 'হিন্দু'র) অবদান বিশ্বসংস্কৃতির ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে। বস্তুতঃ সমগ্র এশিয়াতে ভারত সভ্যতার বাণীদূতের (সিল্‌ভ্যাঁ লেভির ভাষায় L'Inde Civilisastrice) ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রনৈতিক পর্যায়ে পাটলিপুত্র উজ্জয়িনী কনৌজের ভূমিকাও এই যুগে উপেক্ষণীয় নয়। ইতিহাসের এই বিরাট পর্বাধ্যায়কে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে 'হিন্দু' সভ্যতা সংস্কৃতিকে বিচার করা চলে কি? তারপর ভারতে মুসলমান আধিপত্যের কাল। এর মধ্যে শত্রুতার পর্ব, উৎপীড়নের পর্ব যেমন আছে, ভাবরাজ্যে আদান-প্রদানের পর্বও তেমনি আছে; শিল্পে, সঙ্গীতে, লোকসাহিত্যে, লোকস্তরের বিশ্বাস ও সংস্কারে এর প্রচুর নিদর্শনও বর্তমান। বঙ্কিম স্বয়ং বাংলার মধ্যযুগীয় তথাকথিত পাঠান শাসনকালকে বাংলার মধ্যযুগের এক রেনেশাঁস-পর্বরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সম্প্রসারিত ভক্তি-আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সন্তদের দানে সমৃদ্ধ। সমগ্র ভারতবর্ষে সুলতান ও মুঘল রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা সাময়িকভাবে এবং আভাসে মাত্র হলেও, একটি রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ধারণা কি

সৃষ্টি করেনি, প্রাচীনকালে নন্দমৌর্যগুপ্তদের সময় সাময়িকভাবে যেমন করেছিল ? ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে কেবলমাত্র হিন্দুপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করলে এই সমস্যাগুলি অমীমাংসিতই থেকে যায়। বুদ্ধদেব অবশ্যই বেদপ্রামাণ্য মানেন নি, বর্ণব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকার করেন নি। কিন্তু এই বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করেই সম্রাট আশোক সর্বভারতে একরাষ্ট্রই শুধু স্থাপন করেন নি, সর্বধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ও প্রজাসাধারণকে পরস্পরের ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাশীল হবার উপদেশের মাধ্যমে—ধর্মগত বিবাদ ও তিক্ততা দূর করবার জন্য সদাসচেষ্ট হয়েছিলেন। বুদ্ধের বেদ ও বর্ণাশ্রম বিরোধিতা ব্রাহ্মণ্য সংস্কারকে আঘাত করেছিল বটে, কিন্তু তাতে ব্রাহ্মণসমাজকে কোনো দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী কি তারও পূর্ব থেকে ভারতে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ হীনবল হতে আরম্ভ করে, কালক্রমে দেশ থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। ভারত-ইতিহাসের পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে তাই বৌদ্ধধর্মের কোনো ভূমিকা নেই। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এখানেও শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমের সিদ্ধান্ত টিকছে না।

ভারত-ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই বহু বিচিত্রের সমাবেশ-প্রসঙ্গে বঙ্কিমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত পাশাপাশি রাখলে দুই মনীষীর ক্ষেত্রে দুই ভিন্ন প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। ভারতের নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতির অবস্থা বঙ্কিমের দৃষ্টিতে এতই ঐক্যহীন নৈরাজ্য-সূচক বিশৃঙ্খলায় ঠেকেছিল যে তিনি এই অবস্থার প্রতিকার খুঁজেছিলেন পাশ্চাত্য ছাঁচের রাষ্ট্রভিত্তিক nation প্রতিষ্ঠার মধ্যে। এ বিষয়ে 'ইংরেজ' (অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের মাধ্যমে এদেশে আগত পাশ্চাত্ত্য ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান)-এর নিকট পাঠগ্রহণে তাঁর কোনো সংকোচ ছিলনা। ভারতে জাতি গঠন সম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হিন্দু মধ্যবিত্তের সাধারণ মনোভাব ছিল এটাই। বঙ্কিম এ বিষয়ে ব্যতিক্রম নন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এখানে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি তাঁর ইতিহাস-বিষয়ক রচনাগুলিতে বার বার একথার উপর জোর দিয়েছেন যে তৎকালীন পাশ্চাত্য ইতিহাসচর্চায় রাষ্ট্রের শাসননীতি, ভাঙাগড়া, রাজবংশের ডত্থানপতন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ইতিহাস রচনার উপর জোর দেওয়ার যে প্রথা প্রচলিত সেই প্রণালীতে ভারতবর্ষের ইতিহোসের কেন্দ্র-শক্তি রাষ্ট্র নয়, সমাজ। যুগে যুগে রাষ্ট্র ভাঙাগড়ার অন্তরালে সমাজ বিবর্তনের ধারা তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আপন নিয়মে আপন শক্তিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে সেই ধারাকে সার্থকভাবে অনুসরণ করলে ভারত-ইতিহাসের মর্মস্থানটি খুঁজে পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি খুব স্পষ্ট,

"ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়...ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফ্তর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন যেখানে পলিটিক্স নাই সেখানে আবার হিস্ট্রি কিসের, তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল খেতের আবাদ এক নহে ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে সেই প্রাজ্ঞ।...রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে

ভারতবর্ষকে দীন বলিয়াও অন্য বিশেষ দিক হইতে সে দীনতাকে তুচ্ছ করিতে পারা যায়।" (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩০৯)।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যকে এইভাবে ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ তাকে বিস্তারিত পূর্বাপার বিশ্লেষণের উপযুক্ত কয়েকটি সূত্র নির্দেশ করেছেন। তার মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান সূত্রটি হল এই, "নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে ভারতীয় সভ্যতার স্বভাবসিদ্ধ অবিসংবাদিত প্রবণতা।" পূর্বোদ্ধৃত জাভাযাত্রীর পত্রাংশে যে যে মত কথোপকথন ছলে প্রকাশিত তা আরও বিশদভাবে ও স্পষ্টাক্ষরে ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্ররচনার বহু স্থানে। একটি উদাহরণ,

"হিন্দু সভ্যতা যে অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই। প্রাচীন শক জাতীয় জাঠ ও রাজপুত; মিশ্রজাতীয় নেপালী রাজবংশী; দ্রাবিড়ী, তৈলঙ্গী, নায়ার—সকলে আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও সুবিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একত্রে বাস করিয়াছে, হিন্দু সভ্যতা এত বিচিত্র লোককে আশ্রয় দিতে গিয়া নিজেকে নানাপ্রকারে বঞ্চিত করিয়াছে কিন্তু কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই—উচ্চ-নীচ, সবর্ণ-অসবর্ণ সকলকেই ঘনিষ্ঠ করিয়া বাঁধিয়াছে। সকলকে ধর্মের আশ্রয় দিয়াছে, সকলকে কর্তব্যপথে সংযত করিয়া শৈথিল্য ও অধঃপতন হইতে রক্ষা করিয়াছে" ('ভারতবর্ষীয় সমাজ' আত্মশক্তি)।

রবীন্দ্রনাথ-প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সূত্রটির কিছু আভাস পূর্বেই দেওয়া হয়েছে, গুরুত্বের বিবেচনায় এর কিছু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। তাঁর মতে, ভারতীয় সভ্যতায় চিরদিন সমাজসত্তা, রাষ্ট্রসত্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। এই মর্মে পূর্বোদ্ধৃত পঙতিগুলি ছাড়াও আরও অনেক জোরালো উক্তি কবির মধ্যবয়সের নানা রচনায় ছড়িয়ে আছে যার কয়েকটি এখানে চয়িত,

"আমাদের দেশে রাজা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন—প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্তব্য দ্বারা আবদ্ধ। রাজা যুদ্ধ করিতে যান, রাজকার্য করুন বা আমোদ করিয়া দিন কাটান, সে জন্য ধর্মের বিচারে তিনি দায়ী হইবেন। কিন্তু জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপর নিতান্ত নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না—সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্যরূপে বিচিত্র রূপে ভাগ করা রহিয়াছে।...কিন্তু সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত।...বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এজন্য য়ুরোপে পলিটিক্স এত গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। এ জন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি।" ('স্বদেশী সমাজ' আত্মশক্তি)।

কেবল ভারতবর্ষ নয়, কবির দৃষ্টিতে, সমগ্র প্রাচ্য-সভ্যতারই এই বৈশিষ্ট্য,

"প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্মে। ধর্ম বলিতে রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র। তাহার মধ্যে যথাযোগ্য ভাবে রিলিজন পলিটিকস্ সমস্তই আছে। তাহাতে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ

ব্যথিত হইয়া উঠে; কারণ সমাজেই দেশের মর্মস্থান।" ('সমাজভেদ' স্বদেশ)

এ বিষয়ে আরো স্পষ্টোক্তি:

"এ কথা আমাদিগকে বুঝিতেই হইবে আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়ো। অন্য দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে—আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকল প্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে।" ('ভারতবর্ষীয় সমাজ' আত্মশক্তি)।

এই সব উক্তি থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হচ্ছে যে পাশ্চাত্য অর্থে রাষ্ট্র বা 'নেশন' গঠনের সাধনা ভারতের নয়, রাষ্ট্রশক্তির উত্থান-পতনের উপর এখানে সংস্কৃতির উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ভর করেনা, কেননা এখানে জীবনচর্যা রাষ্ট্রনির্ভর নয়, সমাজ নির্ভর। যে 'ধর্ম' সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই কর্তব্যতন্ত্রের রাজা স্রষ্টা নন, রক্ষক। ভারত সভ্যতার পক্ষে এটা গৌরব বা অগৌরব নয়, তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যমাত্র। তবু আধুনিক কালে একটা রাষ্ট্রের বন্ধন স্বীকার না করলে জাতিপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয়না, সম্ভবতঃ এই বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথ সমকালীন রাষ্ট্রীয় ঐক্যস্থাপন প্রচেষ্টাকে গৌণতঃ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেন নি (দ্রষ্টব্য: আত্মশক্তির অন্তর্গত 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' ও 'সফলতার সদুপায়'—(রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৫২২, ৫৫৯)। কিন্তু তাকে সমধিক গুরুত্বও কোথাও দেননি। পাশ্চাত্ত্য 'নেশনবাদ ও 'রাষ্ট্র'বাদ সম্পর্কে তৎসাময়িক বঙ্গীয় ও ভারতীয় মনীষীগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক মোহমুক্ত। বঙ্কিমের জাতিপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বের সঙ্গে এখানেই ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক প্রভেদ।

দেশবাৎসল্য জাতিপ্রতিষ্ঠার অপরিহার্য অঙ্গ। বঙ্কিম তাঁর কালে বঙ্গে বা ভারতে এই বস্তুটির বড়োই অভাব বোধ করেছিলেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী প্রভৃতির পরস্পর বিচ্ছিন্নতা সংকীর্ণতা ও সর্ব ব্যাপারে নিশ্ছিদ্র গণ্ডীবদ্ধ মনোভাব তাঁকে হতাশ করেছিল। মনের সেই বিষাদ ও হতাশা তিনি গোপন করেন নি। 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধে আমরা দেখি তার সখেদ প্রকাশ। বাংলাদেশের পূর্বতন ঐতিহ্যেও তিনি দেশবাৎসল্যের অস্তিত্বের অভাবই লক্ষ করেছিলেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যসংগ্রহের স্বলিখিত ভুমিকায় তিনি প্রসঙ্গটির অবতারণা করেছেন,

"দেশবাৎসল্য পরম ধর্ম্ম, কিন্তু এ ধর্ম্ম অনেকদিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না। কখনও ছিল কিনা বলিতে পারি না।...তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি বা আপন আপন ধর্ম্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় উদার নহে—অনেক নিকৃষ্ট।'

তবে বঙ্কিম আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশভক্তি গুণটির ক্রমপ্রসার ঘটতে দেখে আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে বাংলায় এর অগ্রবর্তী নায়ক রূপে তিন স্মরণীয় পুরুষের উল্লেখ করেছেন—রামমোহন রায়, ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় রামগোপাল ঘোষ এবং Hindoo Patriot সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এঁদের পাশাপাশি তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যে প্রকাশিত 'দেশবাৎস্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইলেও তাঁহাদের অপেক্ষা তীব্র ও বিশুদ্ধ।" ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজি জানতেন না, পাশ্চাত্য

জ্ঞানবিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিলনা। জাতিপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন ভাবে কোনো গভীর চিন্তা করেন নি। তাঁর দেশপ্রেম ছিল সহজ, স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত, একেবারে নির্ভেজাল তাঁর নিজস্ব, কোনো বহিঃপ্রভাব প্রসূত নয়; এই অর্থে বঙ্কিম একে ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দেশপ্রেম অপেক্ষা 'তীব্রতর ও গভীরতর' বলেছেন। গুপ্ত কবির 'মানস-মোহন'-এর অন্তর্ভুক্ত 'মাতৃভাষা' 'স্বদেশ', 'ভারতের অবস্থা', 'ভারতের ভাগ্যবিপ্লব' এবং গ্রন্থাবলীতে সংগৃহীত 'অ-পূর্ব প্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ'-এর অন্তর্গত ''ভারত সন্তানের প্রতি'' কবিতাগুলি পড়লে তাঁর দেশপ্রেমের বঙ্কিম কথিত চরিত্রটি বোঝা যায়। বঙ্কিম কর্তৃক উদ্ধৃত 'স্বদেশ' কবিতার কয়েকটি ছত্র এর বিশিষ্ট উদাহরণ। বিদেশের কোনো মহামূল্যবান্ সম্পদও (ঠাকুর) দেশের অতি সাধারণ, এমন কি নিকৃষ্ট বস্তু (কুকুর) অপেক্ষা এই শ্রেণীর দেশভক্তের দৃষ্টিতে তুচ্ছ। অপর পক্ষে ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের দেশভক্তি তুলনায় এত 'তীব্র' ও 'বিশুদ্ধ' নয়, তাতে বিদেশী চিন্তার ও বিদেশী বঙ্গীর বিস্তর ভেজাল আছে, কিন্তু সেই মুহূর্তে জাতিগঠনমূলক উদ্যমে দেশে যে বহুমুখী কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছিল তা এই পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরেজিনবিশদেরই উদ্যমে। বঙ্কিম নিজেও ছিলেন এই সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি। য়ুরোপের নবযুগের চিন্তাসম্পদের প্রতি এঁদের আগ্রহ এবং শ্রদ্ধা ছিল অসীম এবং সেই প্রভাবেই এঁরা (এঁদের মধ্যে বঙ্কিমও পড়েন) জাতীয়তার নবমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ, এ কথা স্বীকারে এঁদের কোনো দ্বিধা বা সংকোচ ছিলনা। জাতীয় প্রগতির পথে তাঁদের দৃষ্টিতে বাধাস্বরূপ কোনো জীর্ণ দেশীয় সংস্কারকে বর্জন করতেও তাঁদের বিন্দুমাত্র অনীহা ছিল না। সুতরাং যে দেশভক্তি 'বিদেশের ঠাকর'-এর চেয়ে 'দেশের কুকুর'কে পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ মনে করে তা তার গভীর আন্তরিকতা সত্ত্বেও এঁদের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠতে পারেনি। বঙ্কিম আপন চিত্তের ঔদার্যবশতঃ তার অন্তর্নিহিত অন্তরিকতাকে সহৃদয় স্বীকৃতি দিয়েছিলেন মাত্র। ভাবতে আশ্চর্য লাগে ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিভাবনা শিক্ষাগুরু হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও রচিত মাতৃভূমি বন্দনা বিষয়ক ইংরেজি কবিতা ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত তার সুন্দর বঙ্গানুবাদটির কথা এই প্রসঙ্গে তাঁর মনে পড়েনি।

দেশবাৎসল্যের প্রেক্ষাপটে বঙ্কিম ব্যাখ্যাত 'জাতিবৈর' তত্ত্বের কিছু পুনরালোচনার প্রয়োজন আছে। জাতিবৈরের আলোচনা বঙ্কিমের রচনার দুই স্থানে পাওয়া যায়—'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে এবং 'সাধারণী' পত্রিকার ১১ কার্তিক ১২৮০ সংখ্যায় কিছু বিস্তারিত আকারে। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল, কোনো এক জাতি, বিশেষতঃ সে জাতি যদি অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর হয়, যদি উন্নততর জাতির প্রতি খানিকটা প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব পোষণ না করে, তবে তার শক্তিবৃদ্ধি ও অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এই বিরুদ্ধ মনোভাবের নাম তিনি দিয়েছেন 'জাতিবৈর'। তাঁর মতে জাতিবৈর জাতিপ্রতিষ্ঠাকে দৃঢ় ও সংহত করবার পক্ষে একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। এই সূত্রটি তিনি বিশেষভাবে প্রয়োগ করেছিলেন, ইংরেজ-বাঙালীর (তথা ভারতবাসীর) তদানীন্তন পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। ইংরেজ জাতিগতভাবে আমাদের চেয়ে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রসর। তাই স্বভাবতঃ শিক্ষিত

জাতীয়তাবাদী এদেশবাসীর মনে ইংরেজশাসান সম্পর্কে নানা বিষয়ে বিরক্তি ও অসন্তোষ আছে। ইংরেজের প্রতি এই জাতিবৈরের মনোভাব আমাদের আত্মোন্নতির সহায়ক এবং এই প্রেক্ষিতে সর্বাংশে বাঞ্ছনীয়। সর্বক্ষেত্রে ইংরেজের সমকক্ষতা অর্জন করবার এমনকি তাকে অতিক্রম করে যাবার উদ্যম আমাদের জাতিগঠন-প্রচেষ্টাকেও দেশবাৎসল্যকে দৃঢ় করবে। সুতরাং তৎকালীন পারিপার্শ্বিকে তিনি এই জাতিবৈরের দীর্ঘ জীবন কামনা করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোনো জাতির পক্ষে এই বৃত্তিকে লাগাম-ছেঁড়া প্রশ্রয় দেওয়ার বিপদ সম্পর্কেও তিনি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করতে ভোলেন নি। সীমা ছাড়ালেই জাতিবৈর পরজাতি বিদ্বেষে দাঁড়ায়। সে এক সর্বনাশা পরিণাম। ইতিহাসে বহু বিধ্বংসী যুদ্ধ, অনর্থ, অত্যাচারের মূল। উদাহরণ স্বরূপ বঙ্কিম ইতিহাসের জাতিসংঘর্ষ ও সবল কর্তৃক দুর্বল জাতির শোষণ-নিপীড়নের ঘটনাসমূহের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন।

এই প্রেক্ষাপটে বঙ্কিম ব্যাখ্যাত অনুশীলন ধর্মের অঙ্গ প্রীতিবৃত্তির বিকাশ সংক্রান্ত আলোচনার যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা আছে। সেখানে বঙ্কিমের বক্তব্য, মানুষের প্রতিবৃত্তি মনে ভক্তিবৃত্তি থেকে উৎপন্ন। প্রীতিবৃত্তি অনুশীলীনের দুই মার্গ—প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক। য়ুরোপ প্রধানতঃ প্রাকৃতিক মার্গেই অবস্থান করেছে। তাই সেখানে এই সার্থক বৃত্তি অনুশীলনের ফলে আপন স্ফূরণের পথে আত্মপ্রীতি থেকে যাত্রা আরম্ভ করে উত্তরোত্তর আপন পরিবার, কুটুম্ব অনুগত ও আশ্রিত, গোষ্ঠী, গোত্র, গ্রাম, নগর এবং সর্বশেষে নিজ দেশস্থ সকল মানুষের প্রতি সম্প্রসারিত হয়েছে। য়ুরোপের প্রীতিবৃত্তি বিকাশের উচ্চতম সোপান এই হেতু দেশবাৎসল্য বা দেশপ্রেম। য়ুরোপের প্রীতিবৃত্তি বিকাশের উচ্চতম সোপান এই হেতু দেশবাৎসল্য বা দেশপ্রেম। য়ুরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে দেশবাৎসল্য তাই এত প্রবল। হিন্দু (বঙ্কিমের দৃষ্টিতে হিন্দু সংস্কৃতি ও ভারত সংস্কৃতি অভেদ) সংস্কৃতিতে প্রীতিবৃত্তির বিকাশ ঘটেছে আধ্যাত্মিক মার্গ অবলম্বন করে। এই মার্গে প্রীতিবিকাশের পূর্বোল্লিখিত স্তরগুলির অতিরিক্ত উচ্চতর আর একটি স্তর স্বীকৃত, তা হল সর্বমানববাৎসল্য বা লোকবাৎসল্য; দেশবাৎসল্যেরও উপরে এর স্থান। প্রীতি সাধনার এই উচ্চতম স্তরের অনুভূতি বঙ্কিমের মতে হিন্দুর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সঞ্জাত। কঠোপনিষদ ও গীতার বচন সাক্ষ্যস্বরূপ উদ্ধৃত করে বঙ্কিম দেখাবার চেষ্টা করেছেন হিন্দুর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম হলেন সর্বভূতের অন্তরাত্মা এবং সমগ্র প্রাণীজগৎও ব্রহ্মসত্তার মধ্যেই অবস্থিত। এই ভূমিতে সমস্ত মানবজাতি একটি নিবিড় আত্মিক সূত্রে আবদ্ধ এবং মানুষমাত্রেই পরস্পরের গভীর প্রীতির পাত্র। হিন্দু প্রীতিমার্গের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল এই জাগতিক প্রীতি বা লোকবাৎসল্য, পাশ্চাত্য প্রাকৃতিক প্রীতিসাধনার উচ্চতম সোপান দেশবাৎসল্যের উপরে যার স্থান। লোকবাৎসল্য প্রীতিবৃত্তি বিকাশের চরম সীমা। একমাত্র আধ্যাত্মিক মার্গ অনুসরণের দ্বারাই এখানে পৌঁছানো সম্ভব। হিন্দু সংস্কৃতি সেই পথে এই লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে। এই বিশ্বপ্রীতি বা লোকবাৎসল্য হিন্দু সংস্কৃতির চরম সাধ্য ছিল বলেই হিন্দু সভ্যতায় দেশবাৎসল্যের স্বতন্ত্র স্ফূর্তি ঘটেনি, তা হিন্দুর আধ্যাত্মিক বিশ্বপ্রীতি বা লোকবাৎসল্যের অন্তর্নিহিতই থেকে গিয়েছে। কিন্তু প্রীতির চরম সীমা হিসাবে লোকবাৎসল্যকে গণ্য না করলে, দেশবাৎসল্যে এসে থেমে গেলে,

প্রীতিবৃত্তির বিকাশ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বঙ্কিমের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অবশ্য নানা প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে এর সত্যাসত্য যাই হোক তাঁর যুক্তিপরম্পরা অনুসরণ করলে বোঝা যায় কেন তিনি ভারতবাসীর পক্ষে জাতিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও দেশবাৎসল্যের আদর্শ পাশ্চাত্য জগতের নিকট শিক্ষণীয় মনে করেছিলেন। তার পাশাপাশি অবশ্য তিনি চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য সূত্রে আহরিত এই দেশবাৎসল্যের আদর্শের সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতি অনুশীলিত লোকবাৎসল্য বা বিশ্বপ্রীতির এক সামঞ্জস্য। তাঁর দৃষ্টিতে এই সামঞ্জস্যের মধ্যেই জাতিপ্রতিষ্ঠা-তত্ত্বের সম্পূর্ণতা, একমাত্র এই পথেই জাতিবৈর তার অন্তর্নিহিত বিপজ্জনক সম্ভাবনা এড়িয়ে পরিণত হতে পারে আন্তর্জাতিক মৈত্রীতে।

উপসংহারে বলা প্রয়োজন, মাত্র হিন্দুচেতনার মানদণ্ডে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সভ্যতাকে বিচার করলে বিচারক যতই মনীষাসম্পন্ন হন-না-কেন তাঁর সিদ্ধান্তে বেশ কিছু ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে যেতে বাধ্য। ভারতে জাতিগঠন সমস্যা বিষয়ক বঙ্কিমচন্দ্রের সারগর্ভ আলোচনা সেই কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের মনে যে কিছু অতৃপ্তি ও অভাববোধ জাগায় একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যেখানে বঙ্কিম সাধারণ স্তরের বঞ্চিত নিঃস্ব মানুষের দুঃখদুর্দশার কথা আলোচনা করেছেন সেখানে তিনি কোনোরকম ধর্মভেদ বা সম্প্রদায়ভেদকে একেবারেই প্রশ্রয় দেননি। উদাহরণ তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' সেখানে লর্ড কর্ণওয়ালিশের ভূমিব্যবস্থার শিকার সমাজের নীচের তলার শোষিত দারিদ্র্যলাঞ্ছিত এই শ্রেণীর প্রতিনিধি হাসিক শেখ ও রামা কৈবর্ত—দুজনেই এই বাংলার মাটির সন্তান, একই দুঃখে দুঃখী, একই অত্যাচারে-অবিচারে জর্জরিত। সেখানে হিন্দু-মুসলমান ভেদ সম্পূর্ণ তিরোহিত। 'বঙ্গদেশের কৃষক' শেষ করেছেন বঙ্কিম সমাজের সর্বস্তরে ধনের সুষম বণ্টনের পক্ষে জোরালো আর্জি করে,

'জমিদারের ঘরে ধান আছে তাহার একমাত্র কারণ তাঁহারা জমির উৎপন্ন ভোগ করেন। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে প্রজারা সেই উৎপন্ন ভোগ করিত, সুতরাং সেই ধনটা তাহাদের হাতে থাকিত...কেবল দুই চারি ঘরে তাহা রাশীকৃত না হইয়া লক্ষ লক্ষ প্রজার ঘরে ছড়াইয়া পড়িত।...পাঁচ সাতজন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে আর ছয় কোটি লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে ইহা অপেক্ষা অন্যায় কি সংসারে আছে?"

এখানে বঙ্কিম হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ছয় কোটি দরিদ্র, নিপীড়িত দেশবাসীর পক্ষে সওয়াল করছেন, হিন্দুসংস্কার তার প্রতিবন্ধক হয় নি।

এর পরে আসে বঙ্কিমের শিক্ষানীতি। তিনি সে সময়কার বহুল প্রচারিত উচ্চ শিক্ষার Infiltration Theory তে বিশ্বাসী ছিলেন না। জল যেমন মাটি ভেদ করে ভূগর্ভে শেষ স্তর পর্যন্ত চুঁইয়ে যায় তেমনি এই মতানুসারে সমাজের উচ্চশ্রেণীকে যদি শিক্ষিত করা যায় তাহলে সেই শিক্ষার প্রভাব ক্রমশঃ সমাজরে নিম্নস্তরপরম্পরায় সম্প্রসারিত হবে—নিম্নস্তরের মানুষেরাও ক্রমশঃ শিক্ষিত হয়ে উঠবে। বঙ্কিম এ মত সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছিলেন এবং মাতৃভাষায় লোকশিক্ষার উপরই গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন। কেননা তাঁর মতে আমাদের

দেশের উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে যে সহানুভূতি সম্পূর্ণ অভাব তার অন্যতম কারণ উভয়ের মধ্যে গুরুতর শিক্ষাবৈষম্য,

''উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। ...শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে অনেকপ্রকার বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে।' ('বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা)।

সুতরাং বঙ্কিমের মতে জাতির সমাজদেহ সুদৃঢ় ভাবে গড়ে তুলতে হলে দুটি প্রক্রিয়া কার্যকরী হওয়া একান্ত প্রয়োজন: ১। নিম্নবর্গের মধ্যে সুষম ধন বণ্টন, ২। সমাজের সর্বস্তরে–বিশেষতঃ শিক্ষার আলোক – বঞ্চিত দরিদ্র মানুষদের মধ্যে সমান ভাবে শিক্ষার বিস্তার। এখানে তিনি ধর্ম বা সম্প্রদায় বিচারের ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণ মানুষের কথাই ভেবেছেন এবং বলেছেন।

পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বঙ্কিম-চর্চা

হাসান আজিজুল হক

আমি বাংলা সাহিত্যের এক অতি সামান্য লেখক। আজ এখানে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভিটেতে উপস্থিত হতে পেরে এবং তাঁর মূর্তির সামনে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান্ বলে মনে করছি। এটা আমার পক্ষে দুর্লভ সুযোগ। এই অনুষ্ঠানের আয়োজকদের মধ্যে থেকে অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরী রাজশাহিতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। প্রস্তাব শোনামাত্রই আমি অসম্ভব উত্তেজনা বোধ করেছিলাম। আমার মনে আছে, আমি এই নৈহাটিতে এই রেলপথ দিয়ে আমার ছাত্রজীবনে বার বার যাতায়াত করেছি।

এখানে অনেকের সঙ্গে আলাপ করে শুনতে পাই কারও নাড়ি পোতা আছে কুমিল্লায়, কারও চট্টগ্রামে, কারও শ্রীহট্ট জেলায়, কারও দিনাজপুরে। আমার ক্ষেত্রে হয়েছে উল্টো। আমার জন্ম বর্ধমান জেলাতে। যেভাবেই হোক-না-কেন আমি এখন বাংলাদেশের বাসিন্দা। আমার ছাত্রজীবন থেকে কখনো লেখাপড়া করেছি খুলনাতে কখনো রাজশাহিতে। রাজশাহিতে যখন ছাত্র ছিলাম তখন আমার ভারতীয় পাসপোর্ট ছিল। অত্যন্ত লাঞ্ছিত অবস্থায় আমাকে বারবার এই পথে যাতায়াত করতে হয়েছে। তখন স্বপ্ন দেখতাম কখনো হয়তো-বা এখানে নামব। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে যাব। হয়তো এখানকার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হবে, এটা আমার কাছে স্বপ্নই ছিল। আজকে এই স্বপ্ন বাস্তব হয়েছে। সেই জন্য আমি আপনাদের

---

১৩ আষাঢ় ১৪০৪, ২৯ জুন ১৯৯৭—বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিনে পুনর্নির্মিত বঙ্কিমভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ভাষণ। ভিডিও টেপ থেকে লিখন—বিজলি সরকার, রিসার্চ ফেলো - বঙ্কিমভবন, নৈহাটি। এই প্রবন্ধটি প্রাবন্ধিকের সম্মতিক্রমে 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদক ড. সত্যজিৎ চৌধুরীর সৌজন্যে পুনর্মুদ্রিত।

প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিষয় তো আপনারা আমার সামনে দিয়েছেন। আমি নিজে বঙ্কিমচন্দ্রের অসম্ভব ভক্ত একজন পাঠক। আর যখন নিজে লেখালেখি করতে শুরু করেছি—তখন আমি নিজেকে তাঁর ছাত্র বলে বিবেচনা করেছি। অনেক রকমের কথা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বলার আছে। কোথায় তাঁকে জায়গা দেব। আর, তাঁকে অনেক উপরে জায়গা দিয়ে, তাঁকে বাংলা সাহিত্যের অপ্রতিরোধ্য প্রতিভা এই বলার পরেও এ যুগের লেখকদের জন্যও তো কিছু জায়গা করে রাখতে হবে। সেটা খুঁজে বের করাও এক সমস্যা। কাজেই কোথায় বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আমাদের কালের সাহিত্য, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের বাইরে আমার নিজের একটা জায়গা থাকবে, না হলে নিজের কাজকর্মেরও কোনো অর্থ থাকেনা। এই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার নানাবিধ কথা আছে। সেগুলো প্রায় অধিকাংশই বিতর্ক সৃষ্টি করবে। আমার লোভও হচ্ছে এই প্রসঙ্গগুলি এখানে উত্থাপন করি। কিন্তু আমার মনে হয় আজকে সেই সুযোগ নেই। একটা বিষয় আমাকে এখানে আয়োজকরা বেঁধে দিয়েছেন।

পূর্ব-পাকিস্তান ছিল ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত। ২৩ বছর পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের একটি অংশ হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তান ছিল। ১৯৭১ থেকে এটা এখন আর একটা নতুন সার্বভৌম এবং স্বাধীন রাষ্ট্র—বাংলাদেশ নামে পৃথিবীতে পরিচিত। পূর্ব-পাকিস্তান এবং পরবর্তী কালে বাংলাদেশে বঙ্কিমচর্চা কী হয়েছে— এই কথাটা বলতে গেলে আমাকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমি কী ভাবছি, আমাদের দেশের লেখকরা কী ভাবছেন এ বিষয়ে আর বেশি কিছু বলার নেই। সম্ভব আর হচ্ছে না। অন্তত এ বিষয়ের মধ্যে আমি যাচ্ছি না। তবু, কথা বলতে বলতে আমি নানা রকম কথাই বলব।

এটা আমরা একটা হিসেব করে দেখেছি যে, বঙ্কিমের মৃত্যুর মাত্র ৫৩ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে গেছে। ভাগের ভিত্তিটা খেয়াল করে দেখুন। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগ হল। বাংলা আবার ভাগ হল। বাংলা একবার ১৯০৫-এ ভাগ হয়েছিল। সে ভাগটিকে বাঙালি মানেনি। তা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। ১৯০৫-এর ভাগটাকে রাখতে পারা যায়নি। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হল। দুটো রাষ্ট্র হল। কিন্তু বাংলাদেশ উপরিউপর ভাগ হল। এটাকে যদি দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করেন, আজকে আর কিছু করার নেই। এটা যাঁরা করেছিলেন তাঁদের বেশিরভাগই অপগত, তাঁদের আর বলে লাভ নেই। তাঁরা বেঁচে থাকলেও তাঁদের যদি প্রচণ্ড দোষারোপও করতেন, তাতেও কিছুই করার ছিল না। ওই প্রসঙ্গে আমরা যেতেই চাইছি না। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটা প্রসঙ্গ। আমার তাই মনে হয়। আমি যে সমগ্র বাংলা আমার সামনে রেখেছি, আমার কাজের ক্ষেত্রে রেখেছি, পুষ্টি রস সংগ্রহ করার জন্য যে বাঙালি সংস্কৃতির কথা আমি বলছি, আমি নিজেই খণ্ডিত হয়ে ততটা দাবি করতে পারছি না, আপনারাও সবটা দাবি করতে পারছেন না। চাইলেও পারছি না। বাংলাদেশের লেখক-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী যাঁরা আমরা লড়াই করে আসছি বহুকাল থেকে

বাংলাভাষার জন্যে, বাংলা সাহিত্যের জন্যে, বিশেষ করে বাংলা ভাষার জন্যে – আপনারা তা ভালো করেই জানেন।

কিন্তু এই স্বাধীন বাংলাদেশেও যদি সমগ্র বাংলা সাহিত্য এবং সমগ্র বাঙালিকে সঙ্গে নিয়ে বাস্তবভাবে কী করে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মানসে আছে—এটা যদি প্রশ্ন করা যায় তাহলে উত্তর পাওয়া যাবে না। সেখানে একধরণের খণ্ডীকরণ হয়েই গেছে এবং বাংলাদেশ হবার কারণ, পশ্চিমবাংলার মানুষদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—বাংলাদেশের সংস্কৃতির কতদূর পর্যন্ত আপনি টানবেন? মুখে যতই বলুন রাজনৈতিক বিভাজন হয়েছে, মানতে হবে। সাংস্কৃতিক বিভাজন আমরা মানিনা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আজকের বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পুরনো অতীত এবং বর্তমানের সংস্কৃতির যে ভাণ্ডার, তার সঙ্গে আমাদের জীবন্ত যোগাযোগ নেই। এই জীবন্ত যোগাযোগ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের মধ্যেএ নেই। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই জীবন্ত যোগাযোগ নেই। এটা আমি অনুভব করি, আমার প্রতিনিয়ত রক্তক্ষরণ হয়, এটা যেন আপনাদের কাছে বলতে পারি। কারণ যেভাবেই হোক-না, ঘটনাক্রমে আমি এই বাংলার মানুষ হওয়াতে এখানকার সংস্কৃতি বা বাঙালি সংস্কৃতির অনেকটাই আমি নিজের মধ্যে, আমার ছোটোবেলার অভিজ্ঞতার মধ্যে ধারণ করেছি। এবং যেহেতু জীবনের বাকি সময়টা আমি বাংলাদেশে কাটাচ্ছি সেইজন্য সেখানকার সংস্কৃতির মধ্যেও আমাকে প্রতিনিয়ত উপস্থিত থাকতে হচ্ছে। এইজন্য দুই বাংলার বিশাল যে পরিমণ্ডল—সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কত বড়ো, সেটাকে হারানোর মানুষ হিসেবে আমরা যে কতটা হারাচ্ছি, এটা আমি মনে মনে কল্পনা করতে পারি।

আমি বলছিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর ৫০টা বছর মাত্র কেটেছে। তারপর এই ভারত ভাগ। তার সঙ্গে সঙ্গে উপরন্তু পাওনা হিসেবে বাংলা ভাগ। বন্দেমাতরম্ গান যিনি রচনা করেছিলেন তিনি কি বাস্তবে অনুভব করেছিলেন যে এটা ঘটবে? এটা ঘটতে পারে? এবং যদি কল্পনা করতে পারতেন কিসের ভিত্তিতে এটা ভাগ হবে, এটা ঠেকানো যাবে কিনা? আর একটা সম্প্রদায় আছে। যেভাবেই হোক, রাজনীতির সংকট এবং আবর্তের মধ্যে পড়েই হোক, যেভাবেই হোক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশটা ভাগ করার জন্য একটা সম্প্রদায় জীবনপাত করবে, অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটবে – তাহলে আমার ভাবতে ইচ্ছে করে, বঙ্কিমচন্দ্রের যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কল্পনা, বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর যে কল্পনা, যা তিনি তাঁর অনেক ঐতিহাসিক উপন্যাসে এবং সামাজিক উপন্যাসে দেবার চেষ্টা করেছেন—তিনি কি ঠিক এইভাবে কাজটা করতে পারতেন? প্রায় অভিযোগের একটা সুর এসে যাচ্ছে। কিন্তু আমি জানি, সূর্যের সঙ্গে আমাদের যুক্তির তুলনা আমরা করি, অন্ধকারের সামান্য কোণটুকু পর্যন্ত সূর্যের আলোতে পরিষ্কার হয়ে যায়। আমাদের জীবনে যুক্তিও তাই। এবং আমাদের জীবনে সক্রেটিস যদি কেউ থেকে থাকেন, যুক্তিবাদী যদি কেউ থেকে থাকেন, আমি বঙ্কিমচন্দ্রকেই সেই যুক্তিবাদী বলে গণ্য করি। তাঁর মতো এমন নিপুণ যুক্তির অস্ত্র চালনা করতে পারদর্শী মানুষ বাংলা দেশে কেউ বেশি দেখেনি। সমসাময়িকতা আমাদের আচ্ছন্ন করে। কিন্তু সমসাময়িকতা আমরা অতিক্রমও

করি। কখনো সামনেটা আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই না। রবীন্দ্রনাথ বহুরকমের আশঙ্কা করে গিয়েছেন। ভারতবর্ষ ভাগ হবে এইভাবে চিন্তা না করলেও তিনি আগাগোড়া আশঙ্কা প্রকাশ করে গেছেন। আশঙ্কার কারণগুলোও তিনি চিহ্নিত করে গেছেন। সেই জন্যই মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, সীতারাম এই রকম উপন্যাসগুলোর মধ্যে জাতীয়তাবাদের যে ধারণা স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করেছেন, সেখানে বাংলা দেশের বাঙালির পুরো আলাদা একটি সম্প্রদায় নিজেদের এক করার জন্য সোজা ছুটে এইগয়ে আসতে পারছে কি পারছে না, এটা নিয়ে তিনি চিন্তা করতেন যদি, এই দুর্বিষহ বিভাজনের ব্যাপারটা কোনো-না-কোনো ভাবে তাঁর অভিজ্ঞতায়, তাঁর চিন্তার মধ্যে স্থান করে নিতে পারতেন। এটাই সবচেয়ে বড়ো সুযোগ করে দিল এবং ৪৭ সালে দেশ ভাগ করে দিল। জিন্নাসাহেব যে কতটা দক্ষ এবং অনান্তরিক রাজনীতিকের মতো একটা রাষ্ট্র তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন, মানুষের প্রতি কোনো ভালোবাসা তাঁর যে ছিল না, বিশেষ করে বাঙালির প্রতি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ভাষাটাকে সরাসরি বলি দিতে তাঁর কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল না। তিনি সেটা করেছিলেন এবং তার জন্য গর্বও করেছিলেন। বলেছিলেন যে, আমি বৃটিশ শাসকের সঙ্গে সহযোগিতা করেই হোক, এদেশের মুসলমান সামন্ত ভূস্বামীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেই হোক, সবচাইতে বেশি মুসলমান বাঙালি যেখানে আছে তাঁদের বিভ্রান্ত করেই হোক, আমি কিন্তু একটা রাষ্ট্র শেষপর্যন্ত তৈরি করেছি, মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে। এই গর্বটা অনুভব করা এবং এটা প্রচার করার সুযোগ জিন্না সাহেবের হয়েছিল। কিন্তু আপনারা খেয়াল করবেন জিন্নাসাহেব ১৯৪৭ সালের কিছু পরে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন এই যে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান হল, এটা আর একটি জাতি সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে দেখা হবে না। এটাকে একটা আধুনিক গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসাবে দেখা হবে। ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটা তো অসম্ভব, তখন ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। এখনো ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ ব্যবহার করতে পারছি না। ১৯৫১ সালে মুক্তি যুদ্ধের পরেও নয়, ধর্মনিরপেক্ষতা নামে একটা জিনিস আমরা ১৯৭১ সালে আমাদের সংবিধান অর্জনের সূত্রে, স্বাধীনতা অর্জনের সূত্রে আমরা ঢুকিয়ে ছিলাম। এটাকে বার করে দিয়েছি। সমাজতন্ত্র শব্দটা, ধর্মনিরপেক্ষতা—এরকম একটা রাষ্ট্রের কল্পনা যে জিন্নাসাহেব করছেন, এটা ১৯৪৭ সালের পরেই স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন। কারণ তিনি খুব ভালো করেই বুঝেছেন যেভাবে পাকিস্তান তৈরি হয়েছে, সেটা একটা অস্বাভাবিক পন্থা। এই পন্থায় একটা রাষ্ট্র তৈরি হতে পারে না। এর পক্ষে পৃথিবীতে শত শত উদাহরণ খাড়া করা যায়। এক ধর্মাবলম্বীর এক রাষ্ট্র তৈরি করা যায় না। এটা গোটা পৃথিবীর ইতিহাস সমর্থন করছে না, আজকেও নয়। কাজেই রাষ্ট্র কীভাবে আরেক রাষ্ট্র থেকে আলাদা হয়, সেখানে ধর্মটা অতি নগন্য, যৎকিঞ্চিৎ একটা উপাদান—তা উনি বুঝেছিলেন।

কিন্তু পাকিস্তান করার পরে, যারা পাকিস্তান নামক জিনিসটার উপরে শকুনের মতো পড়ে এটাকে লুঠ করারই একটা ক্ষেত্র মনে করতে পারে, তাদের তখন আর জিন্নাসাহেবকেও দরকার নেই। তারা জিন্না সাহেবকে একেবারে কুষ্ঠের মতো বর্জন করেছেন। এবং আপনারা

তো ভালো করেই জানেন যে পাকিস্তান হওয়ার পরে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিকে সংগ্রামটা করতে হয়েছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। তার কারণ হচ্ছে, এই দ্বিজাতি-তত্ত্বের মূল জিনিসগুলি বোধহয় স্পষ্ট হয়েছে ১৯৪৮-এর মধ্যে। প্রথম কাজ যেটা হয়েছে, সে হচ্ছে বাঙালিকে ভাষার দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে, আর তার সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। তাহলে এর সোজা একটা উপায় হচ্ছে সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাঙালির নবজাগরণের যে ফসলটা – এই সমস্তটাকে হিন্দু বলে বর্জন করে দেওয়া। একটা মন্ত্রেই পারা যায়। শুধুমাত্র বাঙালিকে তার ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া আর তার সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। ভাষা আর সংস্কৃতি এই দুটো জিনিস পাকিস্তানের শাসকের কাছে খুব বড়ো ব্যাপার ছিল তা কিন্তু নয়। তারা স্থির জানত এটা না করলে এই জাতিটাকে চিরকালের জন্য রুদ্ধ করে দেওয়া, যাকে বলে চিরকালের জন্য নিঃস্ব করে রাখা অসম্ভব। এটাই মূল কারণ। ১৯৪৮-এর প্রায় গোড়ার দিকে ওই জিন্নাসাহেবই একটা কথা বললেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা একমাত্র উর্দু হবে। এই নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাইনা। সেটা আপনারা ভালো করেই জানেন, এটা কতটা অযৌক্তিক ছিল, দুই বাংলার লোকের সংখ্যার অনুপাত কত ছিল? সে অনুপাতে এটা কখনোই করা যায় না, হতে পারে না – এটা কিন্তু উনি পরিষ্কার করে বললেন।

এইখান থেকেই আমাদের দুটো জিনিস দেখতে হবে যে, বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাঙালি সংস্কৃতি—এই জিনিসটা বাঙালি মধ্যবিত্ত যে জড়িয়ে ধরে আছে, তার নিজস্ব বিকাশ কী? সে বিকাশটা ঘটেনি। দেশ বিভাগের পরে সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটা বিরাট অংশ অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষের নানান জায়গায় পশ্চিমবঙ্গে কাজ করতেন, তাঁরা আর ফিরে যাননি। আজকে জানেন, একটা বিশাল মধ্যবিত্ত বিকাশ ওখানে ঘটেছে। হিন্দু যাঁরা ওখানে ছিলেন, তাঁরা কিছু ইচ্ছে করে এবং এমন কিছু পরিস্থিতি তৈরি করা হল যার ফলে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে কী পরিমাণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ওখান থেকে বিতাড়িত হয়ে চলে এসেছেন, এটা কল্পনা করা যায় না। যাঁরা ইতিহাস জানেন, কমিউনিস্ট পার্কির ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরা এটা ভালো করে বলতে পারবেন। এই রকম হলে যে বিশাল একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয় – এই শূন্যতাটা হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত মুসলমানশ্রেণীর বিকাশের একটা জায়গা। সেই জায়গাটা পাকিস্তানের শাসকরা আঘাত করল, ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন করে। তার মানে কী? ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন করার একটাই অর্থ—ইংরেজি ও উর্দু ছাড়া সমাজের উপরতলায় মধ্যবিত্তের আর যাবার উপায় নেই। এটা খুবই স্পষ্ট হয়েছিল তাদের কাছে। এই কারণেই যদি দেখেন যে এই সময়ে রবীন্দ্র-বিরোধিতা, এর আগে সৈয়দ আলী আহসানের মতো মানুষ ১৯৪৩ সালে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ আমাদের কবি হতে পারেন না, রবীন্দ্রনাথ মুসলমানের কবি হতে পারেন না। ১৯৪৩ সালেই কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ হয়েছে। ১৯৪৮ সালের পরে দেখা যাচ্ছে এই মনোভাব – যেন তেন প্রকারে এমন একটা সাম্প্রদায়িক পরিমণ্ডল ওখানে তৈরি করে ফেলতে হবে যাতে করে বাঙালি সংস্কৃতির সমার্থক হয়ে যাবে হিন্দু সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা হয়ে যাবে সরাসরি হিন্দুদের ভাষা। কোনো জবাব নেই।

যদি বাংলাদেশের বাঙালি বাংলা ভাষাটা বাদ দেয়, তাহলে কোন্ ভাষাতে তারা কথা বলবে তার কোনো জবাব নেই। কিন্তু পরিষ্কার নথিভুক্ত করা হচ্ছে যে, বাংলা ভাষা অচ্ছুৎ। এটা হিন্দুদের ভাষা। এটা তারাই তৈরি করেছে, তারাই ব্যবহার করছে, এটা আমাদের বর্জন করতে হবে। গোটা পাঁচের দশক ধরে একটার পর একটা এই ষড়যন্ত্র হয়ে এসেছে। সে তো আপনারা ভালো করেই জানেন। কখনো বলছে বাংলা ভাষাকে তোমরা রোমান হরফে লেখ, কখনো বলছে আরবি হরফে লেখ, কখনো বলছে বাংলাভাষাকে বাদ দিয়ে অন্য নতুন কিছু করা যায় কিনা – আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সমস্ত পাঁচের দশক ধরে। একটার পর একটা এমন ঘটে গেছে। এই পরিস্থিতিতে কিন্তু কেউ নিজের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছে না, চল্লিশের দশকের প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িকতা-দূষিত যে পরিবেশ, ১৯৪৭ সালে যখন ভাগটা হয়ে গেল সেই পরিবেশটা তো পুরোদস্তুর থেকে গেল এবং সেই পরিবেশটা বজায় রাখার মধ্যেই পাকিস্তানের শাসকদের থাকা-না-থাকা নির্ভর করছে। কাজেই এটা তাদেরও জীবন মরণ সমস্যা। তারা যে পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে ব্যবহার করবে, তার মধ্যে অন্তত পূর্ব-পাকিস্তানের জায়গাটা যেন একটা উপনিবেশ তৈরি করা যায়। তারই অংশ হিসেবে তারা এই ষড়যন্ত্রগুলো করছে।

আমি সেই কারণে দেখতে পাচ্ছি, ১৯৪৭ বাদ দিন, পুরো পাঁচের দশকে বঙ্কিমচর্চা হয়েছে কিনা এটা গবেষণা করে বার করতে হবে। সে গবেষণা এখন হচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে গবেষণা এখন কিছু কিছু হচ্ছে। আমি শুনেছি, আজকের একজন ওখানকার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী আনিসুজ্জামান—তাঁর নাম আপনারা সকলেই জানেন। তিনি ১৯৫৩ সালে বঙ্কিমের উপরে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটা আমি খুঁজেছি। কোথাও পাইনি। এমন কী আমি আনিসুজ্জামানকেও জিজ্ঞাসা করেছি যে আপনি কী লিখেছিলেন? তিনি বলেন, কী এমন অপরাধ করেছিলাম, আমি লিখেছিলাম যে, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদেরও। তখন আমার বয়স কম। ১৯৫৩ সালে আমি ছাত্র। কোনো একটা পত্রিকায় আমি লিখেছিলাম যে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্য কল্পনা করা যায় না, কাজেই পাকিস্তান হলেও, পূর্ব-পাকিস্তানে আমরা আছি, বাস করছি, কিন্তু পুরো বাংলা সাহিত্যটা এবং বঙ্কিমের সাহিত্য আমাদেরও। এই কথাটা বলার পরে আমার বিরুদ্ধে বহু ফাইল নাড়াচাড়া হয়েছে। কেননা আনিসুজ্জামানের মতো বিপজ্জনক ব্যক্তিকে পাকিস্তানে রাখতে পারা যায় না। এবং তাঁকে বিতাড়িত করাটাই সবদিক থেকে সমীচীন। আনিসুজ্জামান এই দেশের মানুষ। তিনি কিন্তু বসিরহাট থেকে গেছেন। তিনি ছোটোবেলায় কোথায় থেকেছেন জানি না, তবে তাঁর পিতৃপুরুষের আবাসস্থল ছিল এই বসিরহাট এলাকায়। এই একটা ঘটনা। তিনি নেহাত ছাত্র ছিলেন, সেই কারণেই হয়তো শেষপর্যন্ত বিতাড়নের ব্যাপারটা তাঁরা ঘটিয়ে তুলতে পারেন নি। কিন্তু এরকম একটা চেষ্টা সে সময় হয়েছিল আনিসুজ্জামানের একটি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে। আমি পাকিস্তানে গিয়েছি পাকিস্তান হওয়ার ঠিক সাত বছর পর। আমি ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানে প্রথম গিয়েছি। তারপরে বলা যেতে পারে পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর-পন্থায় এই পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের ব্যাপারটায় এবং তারপরে মুক্তি যুদ্ধ, আমাদের ওখানকার গণ আন্দোলন, পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশ, তার

পরবর্তীকালে সেনাতন্ত্র, স্বৈরাচারতন্ত্র এই সমস্ত phaseগুলো, পর্যায়গুলোর ভিতর দিয়ে আমি গিয়েছি। সেই জন্য প্রথম সাত বছরে আমি ছিলাম না বটে, কিন্তু যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার আঁচগুলি আমি পেতে শুরু করি।

হ্যাঁ, একটা কথা মনে হতে পারে, আমি যে আপনাদের সামনে বলছি, আমি নিজের কাছেও এই প্রশ্নটা করি যে ১৯৪৮ সাল থেকে বাঙালি প্রতিবাদী, প্রতিবাদের কারণ বাস্তব। বাঙালি মধ্যবিত্তকে মাথা তুলে দাঁড়াতেই হবে। যেখানে কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেই, মধ্যশ্রেণীই যেখানে নেই, যেখানে বহুকাল থেকে তারা পশ্চিমবঙ্গে; ১৯৪৭ সালের পরেই যেন তেন প্রকারে জায়গা একদম খালি হয়ে গেল। কাজেই এখন ট্রেনের যে ইঞ্জিনটা, রাষ্ট্রের যে ইঞ্জিন একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্রুত গড়ে ওঠার একটা ব্যাপার—এই গড়ে ওঠাতে প্রচণ্ড চাপ। এই চাপ থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের থেকে আমাদের চিন্তায়, আমাদের ভাষায়, আমাদের সংস্কৃতির স্বতন্ত্রতা। ১৯৪৮ সালের পর থেকেই এই শাসকদের উপর আমাদের জোর দিতে হয়েছে এবং রক্ত ঝরাতে শুরু করতে হয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে বোঝা যায় বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, বাংলা সাহিত্যের বিভাজনের পরেও তার যে নিরবচ্ছিন্নতা, তার যে continuity—এটা বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণী রাখতে চেয়েছে। তাহলে বঙ্কিমচর্চা আলাদা করে হয়নি কেন?

বঙ্কিমকে যেভাবে হোক শাসকরা চাইতেন দূরে ঠেলে দিতে, তিনি যেন ঢুকতে না পারেন কোনোভাবে। প্রচারও করেছে সেইভাবে। কিন্তু এমনিতেই আমরা লড়ছি তাদের বিরুদ্ধে, সেই লড়াইটা তো শুরু হয়েছে ৪৮ সাল থেকেই। ৫২ সালে এই লড়াইয়ে একটা বিস্ফোরণ পর্যন্ত ঘটে গেছে ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। তাহলে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের জন্যে এই লড়াইটা করছি না কেন? আমার জবাব একটাই, যখন কোনা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আন্দোলন অতিশয় তীব্র একটা জায়গায় পৌঁছে যায়, তখন সাহিত্য-শিল্প বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে মনোনিবেশ করা একটু কঠিনই। তা যদি না হ'ত তাহলে ৪৮ থেকে ৫২ পর্যন্ত অনেকগুলি আনিসুজ্জামান আমাদের পাবার কথা। আনিসুজ্জামান একা প্রতিবাদী নন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আরো অসংখ্য বাঙালি মধ্যবিত্ত যারা উঠতে চাইছে, আসতে চাইছে – লেখক শিল্পী, কবি, তারা তো সবসময় মূলধারাকে চিহ্নিত করেছেন। এই ৯৭ সালেও মূল ধারাতে রয়েছেন। সমগ্র বাঙালি সংস্কৃতি, সমগ্র বাংলা সাহিত্য মুখে অন্তত বলছেন বাস্তবে কী হচ্ছে-না-হচ্ছে সেটা আলাদা ব্যাপার। তবে যদি অবস্থানের কথা বলি তবে বলব, বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী চিরকাল উভয় বাংলার সমগ্র বাংলা সাহিত্যের, সমগ্র বাঙালি সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করতে চেয়েছে। এবং তার জন্যে লড়াই করেছে। কিন্তু পাঁচের দশকের ৫২ সাল পর্যন্ত আমি বঙ্কিমচন্দ্র সংক্রান্ত একটি লেখাও দেখিনি। বিশেষ করে এবছর যখন আমাকে আলোচনা করতে বলা হয়েছে, তখন এ সম্পর্কে আমি খোঁজখবর নিলাম। তাতে দেখা গেল একটি লেখাও পাওয়া যায় না। তবে বঙ্কিমচন্দ্র কত মারাত্মক পাকিস্তানের উগ্রবাদীদের পক্ষে, সে সংক্রান্ত লেখা খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে, যেটা তখনকার শাসকদের পোষা বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা যেমন করে বাংলা

সাহিত্যের বিরুদ্ধে, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে লিখতেন। আমাদের দেশে ক্ষমতায় যাঁরা গেছেন তাঁদের মধ্যেও এরকম বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর প্রচুর ছিল। এবং প্রতিবাদী সাহিত্যের মধ্যেও এরকম মীরজাফর প্রচুর ছিল। এবং এখন পর্যন্ত এরকম মীরজাফর অল্প দু-চারজন জীবিতও আছেন। কিন্তু তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন আমি ৫২ সালের মধ্যে এরকম লেখার সন্ধান পাইনি, বঙ্কিমচন্দ্রের চর্চার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের চর্চা, এটাও আমার চোখে পড়েনি। আমার নিজের ধারণা হচ্ছে বাঙালি মধ্যবিত্তের কোনো সময় ছিল না কোনো ভাববার – সে সময়টা আমরা এখনো পাইনি। এখনো পর্যন্ত আমরা, যে ভাষায় ওখানে বলে – ওখানে একটা প্রবাদ বলে যে, ভিক্ষার দরকার নেই তোমার কুকুর ঠেকাও – আমাদের ঠিক ওরকম একটা জায়গা। যে বাঙালি সংস্কৃতির রবীন্দ্রনাথ, তাঁকে চর্চা করাটা পরে হবে, তাঁকে পড়তে পারব কিনা সেটাই আগে ঠিক করুন। ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছে। আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও স্থিরভাবে ভাববার সময় বা অবকাশ পাইনি। কাজেই আমরা চাই এইটুকুই হোক।

এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫৫ সালে কাজী মহম্মদ ইদ্রিস বলে একজন অধ্যাপক, তিনি আমারও অধ্যাপক ছিলেন ১৯৫৬ সালে রাজশাহি সরকারি কলেজে। মারা গেছেন। তিনি একখানি বই লিখেছিলেন। সেই বইটার একখানি কপিও এখন পাওয়া যায় না। বইটা কৃষ্ণকান্তের উইল-এর উপর লেখা। এই বইটি আমি চোখে দেখিনি। তবে যে পাঠকবর্গকে উদ্দেশ্য করে তিনি এই বইটি লিখেছিলেন তারা মূলত ছাত্রস্থানীয় হবে। ছাত্রদের কাছে, বঙ্কিমচন্দ্রকে এবং তাঁর একখানি উপন্যাসের ব্যাখ্যা করার জন্য বইটি লেখা হয়েছিল। মূল বিষয় ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র। অন্য কোনো প্রসঙ্গ তিনি আনেন নি। ১৯৫৫-৫৬ সালের দিকে এরকম একখানি বই পাওয়া যাচ্ছে। সমগ্র পাঁচের দশকে ধরলে আনিসুজ্জামানের প্রবন্ধ আর ইদ্রিস সাহেবের একখানি বই, এছাড়া আর কিছু কিন্তু আমরা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে পাচ্ছিনা। ষাটের দশক, পাঁচের দশক হচ্ছে সাংঘাতিক ভাবে প্রতিক্রিয়াশীলতার দশক। ৫৪-সালে আমরা যেটা করতে পেরেছিলাম ভাষা আন্দোলনের পরে, ৫২-র পরের ইতিহাসটুকু আপনাদের একটু জানা দরকার। আমরা যদি এটা চালাতে পারতাম ৫২-র পর ৫৪-সালে যে যুক্তফ্রন্ট হল এবং যে নির্বাচন হ'ল – আমরা সেইভাবে যদি রাষ্ট্রটাকে তৈরি করতে পারতাম তাহলে এত exodus হত না। আজকে তাহলে আমার মনে হয়, বাংলাদেশের জনসংখ্যার দশভাগ হিন্দু আছে তো এখন, যদি ৫২ এবং ৫৪ অনুযায়ী দেশকে চালাতে পারা যেত তাহলে পরবর্তীকালে বাংলাদেশ হত কিনা অন্য কথা, তবে হিন্দুর সংখ্যা এত দ্রুত নেমে আসত না। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কারণ ১৯৫০-এর নাটোরের বিপ্লবের সময়ে যেভাবে কমিউনিস্টরা কাজ করেছেন – আপনারা ইলা মিত্রর কথা সকলেই জানেন, কমিউনিস্ট পার্টিরই আন্দোলন ছিল এটা। এটাকে অবলম্বন করে পাকিস্তানি শাসকরা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওই পঞ্চাশের দশকে, ওই পঞ্চাশ সালেই যে কজন বুদ্ধিজীবী, যাকে বলা যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু যারা ছিলেন, তাঁদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেওয়া হল। এ বিবরণ ধনঞ্জয় দাশ লিখেছেন। সেটা অবর্ণনীয় ইতিহাস। আমি সেদিন দেখছিলাম, ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত হিন্দুরা স্বতন্ত্র নির্বাচন চাননি। তাঁরা বেশ বুকের

বল নিয়েই যুক্ত নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। এবং পার্লামেন্টের বিরাট অংশের মোট সদস্য ৬৯ জন। হিন্দু এবং সংখ্যালঘু এই ধরে ৬৯ জন, আমার মনে একটা আশার সঞ্চার হয়েছিল যে, সকলের অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে দেশটা চলবে। ৫২ সালে আমরা সাময়িক ভাবে হলেও রুখে দিতে পেরেছিলাম।

আমি ভাষা আন্দোলনের কথা অল্প একটু বলছি। নুরুল আমিনের নাম শুনতে পাই। তিনি তখন পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রি ছিলেন। তখন গোটা নারায়ণগঞ্জে ঘটনা ঘটেছে। সে সম্পর্কে প্রচার করা হচ্ছে ভারত থেকে দুজনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। গুলি খেয়ে যারা মারা গেছে ঢাকায়, তারা আসলে ভারতীয় নাগরিক। এ গল্প বিশ্বাস করার লোক কিন্তু এখনও আছে। বরং বোড়ছে। সমস্ত ভষা আন্দোলনের ব্যাপারটাকেই তাঁরা বলতে চান, লোকজন পাঠিয়ে দিয়ে হিন্দু এবং তাঁদের কিছু দালাল এই কাজটা করেছেন। খোদ মুখ্যমন্ত্রির মুখ থেকেই এ জাতীয় কথা কিন্তু প্রচারও হয়েছে। কোনো সম্প্রদায়কে আলাদাভাবে নিজের জন্যে জায়গা করে নিতে হবে না – এবং নিজের সম্প্রদায়ের নামে, সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে ভোট চাইতে হবে না। এই দেশের একজন নাগরিক হিসেবে যে আইন চালু আছে সে আইন মেনে নিয়ে তারা এই দেশের যাবতীয় কাজকর্মে, আমলাতন্ত্রে, সরকারে অংশ নিতে পারবে। ৫৪ সালের পরে যে মন্ত্রিসভা হয়, সে মন্ত্রিসভায় ৪ জন হিন্দু ছিল। এই জিনিসগুলো এখন লক্ষ করা দরকার। কিন্তু ৫৪ থেকে ৫৭ এই কয়েকটা বছরে, ৫৭-তে একটা সংবিধান দেওয়া হয়েছিল। ৫৮ সালে আয়ুব সাহেব সরাসরি সেটা খারিজ করে দেন। পাকিস্তানের রাজনৈতিক-ঐতিহ্যকে বলা যায় সাধারণ মানুষের হাতে কখনোই রাষ্ট্র ক্ষমতা দিতে চায় না। এটা পরবর্তীকালের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসেও খুব স্পষ্ট, পরিষ্কার। এবং যখন তারা পূর্ব-পাকিস্তানের অংশ হিসেবে শাসন করত তখন ঠিক এই জিনিসটাই ছিল। পাকিস্তানের শাসন বোঝাত সেনাশাসন। এবং নামকাওয়াস্তে তাদের দেশে একটা সংবিধান দেওয়া আছে, একটা পার্লামেন্ট দেওয়া আছে, একটা সংসদ দেওয়া আছে। এটাও তাদের স্নায়ু কিছুতেই যেন গ্রহণ করত না। ৫৮ থেকে – আয়ুব খান যখন সরাসরি ক্ষমতাটা নিলেন, ৬৮ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেন, অন্ধকার একটা যুগ। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কোনো লেখা আমরা দেখতে পাই না। দু-চারটে সাহসী লেখা শুরু হয়েছে। আহমদ শরীফের নাম আপনারা জানেন। বাংলাদেশের খুব রাগী বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত। তিনি দু'টি লেখা লিখেছেন। কিন্তু বলতেই হবে, স্বীকার করতেই হবে যে, ৪৭ সাল থেকে প্রায় ৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশ তথা পূর্ব-পাকিস্তানের বাইরে যেটা দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্কিমচর্চা প্রায় অনুপস্থিত। তার কারণটা আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারব না। তার কারণ সবটাই সাম্প্রদায়িকতা নয়। একেবারে অসম্ভব ছিল বঙ্কিমচর্চা সেটাও আমি বিশ্বাস করিনা। কিন্তু যেভাবেই হোক-না-কেন বঙ্কিমচন্দ্র কী প্রাসঙ্গিকহীন – এই প্রশ্নটা এখন আবার দেখা দিচ্ছে।

বঙ্কিমচন্দ্র পঠিত হওয়া কিন্তু একদিনের জন্য বন্ধ হয়নি একথা আমাদের বলতে হবে। স্কুলে ছোট্ট করে এবং কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীভুক্ত করা সেটা কিন্তু ৪৭ সালের পর থেকেই আছে। সেটাও আপনাদের আমি স্পষ্ট করেই জানাই। যদি আমাদের অ্যাকাডেমির

ওয়ার্লড দেখেন, তাহলে দেখবেন, সমগ্র বাংলা সাহিত্যটাকেই আমরা অবিভাজ্য বলেই ধরেছি। অনার্স ক্লাসে, এম.এ. ক্লাসে পাঠ্য হিসাবে কারা আছেন যদি দেখেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে দেখতে পাবেন। আর ৫০-এর দশকে আর দুটি কাজ হয়েছে। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে লেখা তো কঠিন ব্যাপার। দুটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয়েছে। একটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। একটি বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। লিখেছেন সৈয়দ আবদুল হাই আর একজন সৈয়দ আলী আহসান। সৈয়দ আলী আহসান মুক্তি যুদ্ধের সময় এখানে এসেছিলেন। সেই সৈয়দ আহসান এখন বাঙালির উত্থান খুঁজছেন বক্তিয়ার খিলজি যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করল তখন থেকে। ১৯৭১ নয়। মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করে বাঙালি এবং বাঙালি মুসলমানের অভ্যুত্থান খোঁজার জন্য ওখানে চলে গেছেন ওঁরা এবং ওঁরা সাঙ্ঘাতিক ভাবে এখন পলাশি এবং সিরাজদ্দৌলার ট্র্যাজিডি নিয়ে ভাবিত। এখন গেলে দেখতে পাবেন কী পরিমাণ সাম্প্রদায়িক এবং মৌলবাদী চিন্তার প্রসার ঘটানো হয়েছে।

বক্তিয়ার খিলজির সেই ১২০১ সালে, সেইখানে যাবার চেষ্টা করছে এক অংশ। এর নেতৃস্থানে একজন রয়েছেন। তিনি সৈয়দ আলী আহসান। সৈয়দ আবদুল হাই তো আত্মহত্যা করেছেন। ১৯৬৯ সালে মারা গেছেন তিনি। যাইহোক এই পরিচয়ের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের সমগ্র পরিচয় তো আসবেই – সেই বৌদ্ধযুগ থেকে, চর্যাপদ থেকে শুরু করে সমগ্র মধ্যযুগের ইতিহাস তাঁরা লিখছেন। কাজেই একটা জায়গায় এসে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেও তাঁরা লিখেছেন। জাকির বিন মহম্মদ আর একজন কট্টর ইসলামপন্থী লোক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন তিনি, তিনিও ব্যক্তিগত ভাবে একা একটি বই লিখেছিলেন। বইটি হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। এই বইটির মধ্যেও একইভাবে বঙ্কিম প্রসঙ্গ আছে। তাই কেউ যদি বলেন কাগজে কলমে বঙ্কিমচন্দ্র কোথায় কোথায় আছেন, কীভাবে আছেন সেটা বলার দরকার নেই। ১৯৪৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত আমরা একজাতীয় শূন্যতা খুঁজে পাচ্ছি। বঙ্কিমচন্দ্র-চর্চা প্রসঙ্গ পাচ্ছি না।

৭১ সালের পর সমস্ত পটটাই বদলে গেল। যদি শাসক এবং শোষিত এইভাগ করতেই চান তাহলে বলতে হয় অন্ততপক্ষে পাকিস্তানিরা বিদায় নিল, পাকিস্তানিরা পশ্চিম পাকিস্তান চলে গেছেন। তাঁরা নেই। তাহলে এ জিনিসটা এখন বাঙালি সমাজের মধ্যে ঘটেছে। এটা একটা নতুন অবস্থান। সবই আছে। হয়তো বলবেন যে পাঁচের দশকে, ছয়ের দশকে যে দেশটা ছিল, সেই দেশটা থেকে মৌলিকভাবে আজকের বাংলাদেশের পার্থক্য কোথায়? তার কোনো জবাব হবে না। পার্থক্য একটাই—আবার দ্বিজাতি-তত্ত্ব বলে যে জিনিসটা এটা কিন্তু শুধু ওলটপালট করছে না, পৃথিবীর সামনে একটা টেকসই তত্ত্ব হতে পারে না। এটা যে ভারত-বিরোধী একটা ভয়ানক তত্ত্ব—এটা জীবন দিয়ে আমরা প্রমাণ করেছি।

আজকে যদি আমরা মৌলবাদে ফিরেও যাই তবু এই সত্যকে অস্বীকার করা যাবে না যে, বাংলাদেশের মানুষ বাঙালি পরিচয়ে একটা লড়াই করেছে এবং সেখানে ধর্ম পরিচয়কে তারা

অস্বীকার করেছে, বর্জন করেছে—এটা fact। আজ যেখানে সে পৌঁছেছে – এই জিনিসটাই আমরা করেছি, তার অনেকরকম অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক—বহু কারণ আছে। আপনাদের সামনে বলতে হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলতে হবে। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে বলব একটা নতুন পটভূমি তৈরি করেছে ১৯৭১-এর পরে। এই পটভূমিতে সমস্ত বাঙালি সংস্কৃতি বাংলা সাহিত্যকে পুনর্বিবেচনা পুনর্মূল্যায়ন-পুনরায় গ্রহণ—এই একটা ব্যাপার এখানে এসে গেছে। যদি রাষ্ট্রের দিকে তাকান তাহলে মনে হতে পারে যে এটা কী রকম রাষ্ট্র, ৭৫ সালে জাতির জনক, স্বাধীনতার যে মূল নায়ক শেখ মুজিবর রহমানকে সপরিবারে মারল, যাকে বলে একেবারে তৃণমূল উচ্ছেদ করল—এ কেমন জাতি? তারপর যে দেশটা একজন সেনাশাসক, স্বৈরাচারী শাসকের দ্বারা বছরের পর বছর শাসিত হচ্ছে, একজন জেনারেল এলেন জিয়ায়ুর রহমান—তিনি কিছুদিন গণতন্ত্রের চর্চা করলেন। তা বলা যায় খুবই নিরাপদ, সীমাবদ্ধ। যে গণতন্ত্র সাম্প্রদায়িকতা, নানা রকমের বৈষম্য, বিশেষ করে হিন্দুদের প্রতি মারাত্মক রকমের আইন প্রণয়ন সবই আমরা পাচ্ছি—এই জিনিসগুলো আপনারা বলতে পারেন, কিন্তু আমি বলব, এটা শাসকের দিক থেকে। কিন্তু একটা সমাজ তো বহু রকমের মানুষের দ্বারা তৈরি, সেখানে বুদ্ধিজীবীদের তো একটা ভূমিকা থাকবে—যা পালন করে এসেছে ওই ১৯৪৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত। সেই একই বুদ্ধিজীবী একটি সাংস্কৃতিক বোধের দিক থেকে যে তাঁর চর্চা করতে চাননি তা তো নয়, তাঁরা সেটা চেষ্টাও করেছেন। এই জন্য দেখা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রকে নতুনভাবে দেখবার একটা চেষ্টা ৭১ সালের পর থেকে হচ্ছে। এবং সে বিষয়ে আহমদ শরীফ প্রথম কিছু লিখেছেন। পরবর্তীকালে লিখেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি ওখানে নিজেকে একজন মার্কসিস্ট বলেন। তিনি সেভাবেই পরিচিত। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেন। তাঁর ব্যাপক একটা আগ্রহ দেখা দিল বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নিয়ে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। নানা জায়গায় তিনি সে প্রবন্ধগুলি লিখেছেন। সেগুলিকে এক জায়গায় করে বই—তাঁর বইয়ের নাম বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক। কী আছে এই বইয়ের মধ্যে? সে কী পছন্দসই, সে কী সঠিক? সেটা একেবারেই ভিন্ন প্রসঙ্গ। স্বাধীনতার পরেও কিন্তু এই যে ব্যাপক মনোযোগ, এই মনোযোগটা কিন্তু আসতে শুরু করেছে। ১৯৭৩, ৭৪, ৭৫ এই সালগুলিতে সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন। ১৯৭৯-তে তিনি প্রকাশ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক।

আমি যদি মনে করি, যে জায়গা থেকে তিনি দেখা শুরু করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রকে সে জায়গা থেকে দেখা সঠিক নয়। বঙ্কিমচন্দ্রকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন তিনি। যেটা এখন বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে, তিনি কত বড়ো শিল্পী ছিলেন। মানুষকে কতটা জ্যান্তভাবে তাঁর উপন্যাসে হাজির করতে পেরেছিলেন। এবং মানুষের জীবনের কতটা গভীরে তিনি ঢুকতে পেরেছিলেন? যে বঙ্কিম তত্ত্ব প্রচার করেন, যে বঙ্কিম আদর্শ প্রচার করেন, যে বঙ্কিম তত্ত্ব খুঁজতে গিয়ে নিজের শিল্পীসত্তার বিরুদ্ধে নিজেই লড়াই করতে থাকেন, যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর নানা সংস্কার আন্দোলনের বেশিরভাগই সমর্থন করতে চান না, সেই

বঙ্কিমই মানুষের রক্তের যে কল্লোল ঠিকই শুনতে পান। যিনি বলেন, যে পণ্ডিত বিধবাবিবাহ দিতে চায় যে আবার কিসের পণ্ডিত। একজন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সেকথা বলিয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল-এ রোহিণী তো বিধবাই। ওই বিধবার ছবি তিনি যদি শিল্পী না হতেন, তিনি যদি কেবলই একজন আদর্শবান্ নীতিবাগীশ, তাত্ত্বিক, সাম্প্রদায়িক মানুষ হতেন, তাহলে তিনি তো বুঝতে পারতেন এটা তো ক্ষতি করবে। বহু বিধবাকে উত্তেজিত করবে, বহু বিধবাকে অনুপ্রাণিত করবে রক্ত এবং মাংসের পথ ধরে চলবার জন্য। এটা তো সত্যি কথা। যেভাবে আজকে আমরা শেক্সপিয়রকে দেখি। শেক্সপিয়রের মধ্যে ইহুদি বিদ্বেষ ছিল কী ছিল না এ জিনিস আজকে কোনো বড়ো ব্যাপার নয় কিন্তু, সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে কতটা ইংরেজ প্রীতি ছিল এবং ইংরেজ সৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তাঁর কতটা সমর্থন ছিল এবং সেই সমর্থন কোন্ কোন্ উপন্যাসে কতটা প্রকাশ পেয়েছে এই কাজটাতে সমস্ত মনোনিবেশ করেছেন আমাদের সিরাজুল ইসলামরা। তাতে বঙ্কিমের উপর ব্যাপক অবিচার করা হয়েছে। আমার মনে হয় বঙ্কিমকে দেখবার পথও এটা নয়। বঙ্কিমের সমগ্র সাহিত্য যে জায়গায় এসে শেষ হয়েছে—এর একটাও তো বর্তমান ভারতের, বাংলাদেশের জন্য জীবন্ত বিষয় এখন আর নয়। কাজেই ওই বিতর্ক ছেড়ে দিতে হবে। এই বিতর্ক এখানেও চলছে আমি জানি। সেদিনও চতুরঙ্গ পত্রিকায় দেখলাম বঙ্কিমচন্দ্র কী সাম্প্রদায়িক ছিলেন, না কী ছিলেন না? ১৯৮৮ সালে আমি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলাম। সেখানে B.B.C. আমাকে একটাই প্রশ্ন করেছে, আপনি বলুন বঙ্কিমচন্দ্র কি সাম্প্রদায়িক ছিলেন কি ছিলেন না? আমি বললাম, এটা আদৌ কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

কাজেই আমরা যদি মানুষ থাকি, অন্য কোনো জীবজন্তুতে রূপান্তরিত না হই, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা কখনোই বর্জন করতে পারব না। একটা দিক্ নির্দেশনা মানুষ সম্বন্ধে আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েই যাব। কিন্তু মানুষকে তিনি কী হতে বলেছেন তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, এইটেই বিশুদ্ধ, এইটেই করা উচিত—এখন এটা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। যে সময়ে যে জিনিসগুলো অত্যন্ত জীবন্ত থাকে, অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক থাকে, তার সঙ্গে আপনি নিজেকে না জড়িয়ে পারেন না। কিন্তু যে জিনিসটা অপগত হয়ে গেছে, অপগত হয়ে যাবার পরে সোনার উপরে যত ময়লা জমেছে, সব পরিষ্কার করে এখন খাঁটি সোনাটিকে পাবার সময় হয়েছে। সেই বঙ্কিমকে কি আমরা এইবার বার করবার চেষ্টা করব না? মাটি চাপা পড়ে হোক, ছাই চাপা পড়ে হোক, যার জন্যে ওঁর সবটা আমাদের চোখে পড়েনি, সব কিছু এখন সরিয়ে ওঁকে এখন ঝক্‌ঝকে সোনার মতো যে বঙ্কিম, চিরস্থায়ী যে বঙ্কিম, তাঁকে কি আমাদের আবিষ্কার করতে হবে না? এই চেষ্টাটা কিন্তু এখনও হয়নি। কাজটা এখনও শুরু হয়নি। কাজটা কিন্তু এখনও আপনাদের এখানেও অল্পবিস্তর বাকি আছে। যে কারণে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর লেখাটা এত একপেশে হয়ে গেল। মনে হল বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিকও ছিলেন না, ঔপন্যাসিকও ছিলেন না। এরকম কোনো লোক ছিলেন না। তাঁর কতগুলো সামাজিক-অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক-সম্প্রদায়গত মত ছিল। সে মতগুলো ঠিক ছিল না—এইটা প্রচার করা, প্রমাণ করা

এবং প্রমাণ করে আমি ঠিক বলেছি এই রকম একটা আনন্দ পাওয়া। এই রকম একটা জিনিস সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মধ্যে কাজ করেছে যে, আমি কী একটা অখণ্ড যুক্তি দিলাম না? বঙ্কিম একজন সামান্তবাদী ছিলেন, তিনি একজন ইংরেজের, সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ছিলেন। এদিকে আলোচনা নিয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন এখন দেখছি না।

এইজন্য ১৯৮৮ সালে বঙ্কিমের সার্ধশতবার্ষিক জয়ন্তী যখন হল, আপনাদের বলতে পারি, তখন বাংলাদেশে একটা বিরাট কমিটি তৈরি হয়েছিল, এটা পালন করার জন্য। আবুল কাসেম ফজলুল হক—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, এবং বাংলাদেশ উপন্যাস পরিষদ সংগঠক। তিনি লোকায়ত বলে একটি পত্রিকা বের করেন। এর গত দশ থেকে পনের বছর পর্যন্ত একটাই কাজ। সেটা হচ্ছে যে, সমাজে যদি নীতিপরায়ণ মানুষ তৈরি করতে পারা না যায় তাহলে মার্কস্‌বাদ দিয়েও কিছু হবে না, বুর্জোয়াতন্ত্র দিয়েও কিছু হবে না। সমাজে নীতিপরায়ণ মানুষ তৈরি করতে হবে। এই হচ্ছে ওঁর তত্ত্ব। এই তত্ত্বে তিনি সবসময় সামনে আনছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। বঙ্কিমচন্দ্রের ওইসব কথা। জীবন লইয়া কী করিতে হয়। উনি বলেছেন—এসো আমরা এই জিনিসগুলি আলোচনা করি। বঙ্কিমচন্দ্র এই আলোচনা করেছেন। — যে এই জীবনটা আমরা পেয়েছি, এই জীবন লইয়া কী করিব, এই জীবন লইয়া কী করিতে হয়। সাহিত্য রচনাই বা কেন করিব। এই প্রসঙ্গগুলি নিয়ে এসে বহুদিন ধরে আবুল কাসেম ফজলুল হক একটির পর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন এবং বঙ্কিম সার্ধশতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষে ইনি এগিয়ে এসে একটি বড়ো কমিটি তৈরি করেছেন। আমরা সকলেই এই কমিটির মধ্যে ছিলাম। কিন্তু বুঝতেই তো পারেন, সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে তো বিশেষ কিছু করা যায় না। কাজেই একটা বড়ো সেমিনার হল। এই সেমিনারে বাংলাদেশের সমগ্র অগ্রসর বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আসা হল। বোধ হয় সেখানে বদরুদ্দীন উপর এসেছিলেন, আহমদ শরীফ এসেছিলেন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এসেছিলেন, আনিসুজ্জামান এসেছিলেন। এঁরা সকলেই সেই সেমিনারে এসেছিলেন। তাঁরা সকলেই সেখানে কথা বলেছেন। এখানে যা কিছু আলোচনা হয়েছে এবং এখানে যে প্রবন্ধ পাঠ করা হয়েছে, সমস্ত প্রবন্ধ এবং সমস্ত আলোচনা একসঙ্গে ক'রে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে বঙ্কিমচর্চার ক্ষেত্রে এটা একটা খুব উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

আমি দেখতে পাই, বঙ্কিমকে নিয়ে অন্য কাজও কিছু হয়েছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাজশাহি)—যাঁর কথা আমি অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরীকে বলেছিলাম, ডক্টর সারওয়ার জাহান, এর ঠিক যে বিষয় ছিল বলে আমি বলছি না। আমার কাছে তার একটা বইও সঙ্গে আছে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে। শৈল্পিক আলোচনার মধ্যে তিনি যাননি। ইনি বলতে চেয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়নের ব্যাপারে দেশ ও কালের পটভূমিতে পরিবর্তন আসছে এবং সে পরিবর্তনের প্রয়োজন। কী ধরণের পরিবর্তন আসছে, বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়নের রাস্তাগুলো কী হতে পারে, এই রকম। তারপরে তিনি আর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, সে বইটির নাম হচ্ছে বঙ্কিম উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র। এখন এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই। বঙ্কিমকে

নিয়ে তাঁর জীবনকালে যে বিতর্কগুলো হয়েছে, তৎকালে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, বিশেষ করে মুসলিম সম্পর্কিত পত্রপত্রিকায়, সে গুলোকে নিয়ে চমৎকার একটা তুলনামূলক আলোচনা কিন্তু ডক্টর সারওয়ার জাহান তাঁর এই বইটার মধ্যে করেছেন। এবং তিনি ইচ্ছা করেই বলেছেন যে এই মুসলিম প্রসঙ্গ বা সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গ যেখানে আছে একমাত্র সেইগুলি তাঁর আলোচনার বিষয়। আমি আপনাদের বলতে পারি, আজকে বাংলাদেশে, বুদ্ধিজীবীদের প্রধান অংশ সম্ভবত বঙ্কিমকে এই প্রসঙ্গগুলো থেকে বিযুক্ত করে ফেলেছেন—যে বঙ্কিম কি সাম্প্রদায়িক ছিলেন?

তেমনি আমার নিজের বক্তব্য একটু আগে আপনাদের বললাম। চুলচেরা বিচার করা যায়। করলেও হয়তো মোটা দাগে বঙ্কিমকে সরাসরি সাম্প্রদায়িক বলে অভিযুক্ত করা হচ্ছে, সেটা টিকবে না। যত পরিষ্কার করে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাগুলো আমরা সামনে নিয়ে আসিনা কেন, সম্ভবত এর বহু রকমের জবাব আমরা খুঁজে পাব। এবং আরও একটা বিষয়ে বলতে পারি যে, আমি কখন কথা বলি, কী কথা বলি, আমি যে কথাই বলি-না-কেন, আমার কথাগুলোকে আমার কালের এবং আমার সমাজের সঙ্গে যুক্ত করতেই হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ-এর কথাই বলুন, সীতারাম-এর কথাই বলুন, কী মৃণালিনী-র কথাই বলুন, তাহলে দেখতেই হবে, কী বিষয় তাঁর উপন্যাসের মধ্যে এসেছে এবং কী পরিবেশ এবং কী পরিস্থিতির মধ্যে বঙ্কিম লিখেছেন। এগুলিকে যদি আলাদা আলাদা করি তাহলে খুব সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক বলা যেতে পারে। কিন্তু যদি আমি relate করি, যদি বাংলা দেশের দিকে একবার তাকাই, যদি বৃটিশ শাসনের একশো বছর পার হয়ে যাবার পরে ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৮ বা তার পরবর্তী কালের বাংলা দেশের দিকে যদি তাকাই, তাহলে যে-বাঙালি স্বাধীনতা চায়, সে যে রাষ্ট্রের কল্পনা করে, সে রাষ্ট্র কেমন হতে পারে, এটা ১৯৯৭ দেখে আপনি অনুমান করতে পারবেন না। সেটা ১৮৭০-এর দশকেই রেখে দেখতে হবে।

এটা এক রকম কথা গেল। যদি বলেন বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা কোন্ স্তরে, কোথায়; তাঁর বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ করতেই চাই— তাহলে আর কথা সাহিত্যের দিকে না তাকিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা এবং ভাবনার দিকে যেতে পারি। যেখানে তিনি রাষ্ট্র সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন, সমাজ সম্পর্কে চিন্তা করেছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপরে বই পর্যন্ত লিখেছেন, যার আলোচনা বদরুদ্দীন উমরের বইয়ে যে সমস্ত লেখা আছে সেখানে আমরা পাচ্ছি, এইদিকে যদি তাকাই তাহলে মনে হতে পারে, বঙ্কিম স্পষ্টত মনে করতেন যে বাংলা দেশ হিন্দু এবং মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মিলিত একটা দেশ। তা না হলে ওই রামা কৈবর্ত এবং হাসিম সেখ পাশাপাশি উচ্চারণ করার কোনোই প্রয়োজন বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না। লোকায়ত বাংলা দেশের দিকে, চিরকালীন বাংলাদেশের দিকে তিনি দেখতেই তো পাচ্ছেন। এখানে জ্বলজ্যান্ত বাস্তব রামা কৈবর্ত এবং হাসিম সেখ। তাদের সংস্কৃতি, তাদের চিন্তা তিনি তো বাদ দেননি।

এই প্রসঙ্গটা নিয়ে আমার বহু কথা বলার আছে কিন্তু আজকে আর আমি এই প্রসঙ্গ বাড়াতে

চাই না। অনেকক্ষণ আমি আপনাদের সামনে কথা বলেছি। কিন্তু আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো এখন যুক্তির আলোকে স্পষ্ট এবং পরিষ্কার করে বাংলাদেশে দেখা হচ্ছে। অতি সম্প্রতি দেখে এলাম শান্তনু কায়সার একটা বই লিখেছেন। অতি চমৎকার বই। এ বইটাও কিন্তু পড়ার মতো বই, কারণ, এই বইয়ে এইসব প্রসঙ্গ নেই। শিল্পী বঙ্কিম কত বড়ো, কত উঁচু, বাংলা সাহিত্যে তিনি কত বড়ো সাহিত্যিক এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যে সাহিত্য– সেটাকে সামনে আনার চেষ্টা করছেন। দেখানো যায় যে মৌলিকভাবে উনি কতটা শক্তিশালী সাহিত্যিক ছিলেন। এই চেষ্টা আমাদের মধ্যে এখন কেউ কেউ করেছেন।

আরও মজার কথা আছে। আমাদের একজন লেখক, চিন্তাবিদ্ আছেন তাঁর নাম আহমদ ছফা। তাঁর সম্বন্ধে আমার তেমন কিছু বলার নেই। উনি কিন্তু প্রচুর লিখেছেন এবং এখানকার যাঁরা একটু সন্ধানী পাঠক তাঁরা কিন্তু আহমদ ছফার বাঙালী মুসলমানের মন, বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস ইত্যাদি বই দেখে থাকতে পারেন। শক্ত মতামতের লোক তিনি। ইনি সম্প্রতি একটি পত্রিকা বের করেছেন। নাম উত্থান। কিন্তু উত্থানটা কিসের সেটা জিজ্ঞাসা করলে যে জবাব পাওয়া যায়, সেটা বড়ো স্পষ্ট নয়। সেটা এইরকম যে, বাংলাদেশের reality-র দিকে আপনারা তাকিয়ে দেখুন, প্রবল উপাদানগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাহলে কেন বাংলাদেশের সংস্কৃতি একটা আলাদা চেহারা নেবে না, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি থেকে বাংলাভাষা কেন একটা আলাদা চেহারা নেবে না, অন্য সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতির স্মৃতি এবং তার অসংখ্য অনুষঙ্গ–তার মধ্যে ঢুকে আছে এটা কেন গ্রহণযোগ্য হবে, বাংলা ভাষার লব্জের মধ্যে উপস্থিত আছে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি। তার ভাবনা, তার চিন্তা, তার অতীত, একটা বিশাল ঐতিহ্য–আমরা সেটা নেব কী করে? কিন্তু যে জীবনটা যাপিত হচ্ছে বাংলাদেশে সেই reality-র দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে কেন আলাদা সাহিত্য তৈরি হবে না, কেন নতুন বাংলা তৈরি হবে না – এবং তা করতে গেলে আমরা এই জিনিসগুলো টেনে এনে, মানে, সমগ্র বাংলা সাহিত্য, সমগ্র বাঙালি সংস্কৃতি– এই অস্পষ্ট জিনিসগুলো টেনে এনে নির্দিষ্ট এবং সুন্দর যাকে বলা যায়–refined একটা জিনিসকে কেন নষ্ট করব, এটা বোঝা যায় না। এইটে হচ্ছে ওঁর বক্তব্য। ওঁর বক্তব্যের সমর্থনে আরও কিছু মানষ আছেন। তাঁরা নিজেদের বামপন্থী বলেন এবং তাঁদের সাম্প্রদায়িক কিছুতেই বলা যাবে না। অনেকে অবশ্য এ মত পোষণ করতে পারেন যে এঁদের অবস্থান শেষ পর্যন্ত যাঁরা সাম্প্রদায়িকতাবাদী, তাঁদেরই অবস্থানটাকে জোরদার করছে। তাঁরা অবশ্য এটা মানেন না। এক্সট্রিম যে মীট করে, চরম বামপন্থী চিন্তা আর চরম দক্ষিণপন্থী চিন্তা যে একটা জায়গায় গিয়ে মীট করে এক হয়ে যাচ্ছে–ভারতবর্ষেও যা দেখা যাচ্ছে। এই নতুন জিনিসটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। আহমদ ছফা যে বইখানি লিখেছেন তার বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র। নাম হচ্ছে শতবর্ষের ফেরারি। এই ফেরারিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন আহমদ ছফা। বঙ্কিম দুই বাংলার মানুষের জন্যে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক থাকতে পারেন নি এবং এখন প্রাসঙ্গিক নন। অভিযোগের আকারেই কথাটা তুলেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়–বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এটা খুবই একটা সীমিত সংখ্যক মানুষের মত। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সাধারণ যে মনোভাব তার প্রতিনিধিত্ব

করছে না। বরং যুক্তির আলোকে বঙ্কিমকে পুনর্মুল্যায়িত করা—এই দিকেই যেন, ডক্টর সারওয়ার জাহান, যা করেছেন বা বদরুদ্দীন উমর—তাতে বঙ্কিমকে নতুন করে দেখবার চেষ্টা আছে। তাতে হয়তো সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক এই প্রসঙ্গগুলোতে নতুন করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা রয়েছে। মানুষ কেন সাম্প্রদায়িক, বা সাম্প্রদায়িক হবার পেছনে যুক্তিগুলো কী থাকে—এগুলো সামনে নিয়ে আসছেন।

আমার আর-একটি কথা মনে হয়, সাহিত্য জিনিসটা এখন আর বিশুদ্ধ নেই। গোটা পৃথিবীতেও নেই। সাহিত্য যে কখন রাজনৈতিক নিবন্ধ, কখন যে একটা সাংস্কৃতিক মত, কখন যে প্রচণ্ড রকমের সমাজতাত্ত্বিক একটা আলোচনা – এটা এখন বোঝা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। আলাদা করা যায় না। নতুন সাহিত্য যা আমরা দেখছি তাতে যাবতীয় বিষয় এর মধ্যে ঢুকছে। এবং তারা নিজেরা হারাচ্ছে। কোনো নতুন আকার নিচ্ছে এমনও বলা যায় না। পশ্চিমবাংলাতেও অল্পবিস্তর এরকম দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে উগ্রতা আছে। এটা সাম্প্রদায়িকতা নয়। এটা হল সবাইকে উপেক্ষা করা। এ জিনিস কালে কালেই হয়। বঙ্কিমচন্দ্রও এরকম বিদ্রোহ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধেও পরবর্তীকালে অন্যেরা বিদ্রোহ করছেন। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও এ বিদ্রোহ হয়েছে। এটা হয়। মানুষের সমাজ যে জ্যান্ত সমাজ। মানুষ যে পরিবর্তনশীল, নতুন নতুন অভিজ্ঞতার অভিঘাতে নিজেও যে নতুন হয়ে ওঠে, শেষ স্থির কোনো কথা যে নেই, সে হল এক নির্মীয়মান বাস্তবতা—এ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। মানুষ নামক ব্যক্তির, ইনডিভিজুয়ালের। নতুন করে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। সেখান থেকে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কিত নতুন চোখে দেখার একটা চেষ্টা দেখতে পাই।

যদি বলেন বঙ্কিমচন্দ্র কতটা জনপ্রিয়? তাহলে দুই বাংলার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা অবাস্তব মনে হয়। যদি আমরা তুলনা করি টি.ভি. কতটা জনপ্রিয় এবং টি.ভি-র রাম-রাবণের যুদ্ধ কতটা জনপ্রিয় তাহলে বলতে হবে যে এ একেবারে খেয়ে ফেলল। কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ কতটা জনপ্রিয় আপনাদের জবাব দিতে বেশ কষ্ট হবে। বলতে হবে এসব কেউ ছুঁয়েও দেখে না। এরকম একটা পরিস্থিতি হয়েছে। গোটা সাহিত্য সম্পর্কেই হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেও হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই দশা। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাদের ওঠাবসা করতে হয়। তাদের সঙ্গে কথা বলে মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। মনে হয় ও কী যুগের সামনে এসে পড়লাম। একটা এম.এ. পাশ করা ছেলে বঙ্কিমচন্দ্র নামের বানানটাও তো ঠিক করে লিখতে পারবে না। জনপ্রিয়তার কথা যদি বলেন সাহিত্য কেউ পড়ছে না, ছুঁয়েও দেখে না। এরকম একটা অবস্থা কিন্তু হচ্ছে। যদি বলেন, আমাদের দেশের সাধারণ বুদ্ধিজীবী মানুষের চিন্তায় এবং ভাবনায় বঙ্কিমচন্দ্র কতটা উপস্থিত, তাহলে বলব বঙ্কিমচন্দ্রের একান্ত প্রাতিস্বিক দিক যেগুলো, সেগুলো আর সেইভাবে উপস্থিত নেই। কিন্তু সাহিত্যও মরবে না, যতই টেলিভিশন হোক, প্রযুক্তি যতই এগিয়ে যাক, সাহিত্যকে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলা সম্ভব না। আর বঙ্কিমচন্দ্রকেও। বঙ্কিমচন্দ্র এত আয়ু নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁকেও শেষ করে দেওয়া, সেটা কেউ করতে পারবে না। আমার নিজের

এই রকম ধারণা।

আমার নিজের কথা আজ আর বলা হবে না। আমি বক্তৃতা খুবই লম্বা করে ফেলেছি। তবে আশা করি এখানকার কাজের পরিকল্পনা যেভাবে করা হচ্ছে তাতে হয়তো আমন্ত্রিত হয়েই হোক আর রবাহুত হয়েই হোক—অদূর ভবিষ্যতে আবার নৈহাটিতে আসার সুযোগ হবে এবং আমার কথাগুলো আবার অন্য অনেক ভাবে বলতে পারব।

তবে একটা কথা বলি। শ্রেষ্ঠ বলে কোনো কথা নেই একথা সত্য, আবার শ্রেষ্ঠ বলে একটা ব্যাপার আছে একথাও সত্য। কোনো একজনের শ্রেষ্ঠতার সঙ্গে আর একজনের শ্রেষ্ঠতার কাটাকাটি হয় না। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের কাটাকাটি হয় না। এই রকম শ্রেষ্ঠত্ব বলে কিছু নাই। সমস্ত বাংলা সাহিত্যটাকে যদি আমার সামনে রাখি, যদি দেখি মানুষ সেখানে কেমন করে হাজির হয়েছে; কত বাস্তব কত সত্যভাবে হাজির, মিথ্যা ভাবেও তো হাজির করা যায়, কত সত্যভাবে, কত জ্যান্তভাবে, মানুষের কী করা উচিত এবং কী করা অনুচিত এই নীতি শাস্ত্রটা বাদ দিয়ে, মানুষকে তার সমস্ত নির্মোক উন্মোচন করে, মানুষের শেষ সত্যে গিয়ে পৌঁছনো, মানুষটাকে চেনা, এটার যদি কোনো পরিমাপ থাকে তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের উপরে আমরা এখনও কেউ পৌঁছতে পারিনি। এটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত মত। কাজেই যদি আমরা মানুষ থাকি, অন্য কোনো জীব-জানোয়ারে রূপান্তরিত না হই, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা কখনোই বর্জন করতে পারব না। একটা দিক নির্দেশনা তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েই যাব। কিন্তু মানুষকে তিনি যে কী হতে বলেছেন তা নিয়ে তর্কবিতর্ক অনেক হবে। সেসব আমি মানতে বাধ্য নই। তিনি নিজেও যে মানেন নি তাঁর সাহিত্যে সেটা খুবই পরিষ্কার। সেটা কৃষ্ণকান্তের উইল পড়ুন, বিষবৃক্ষই পড়ুন। তিনি তো আশা করেন—'আমি বিষবৃক্ষ রোপন করিলাম। আশাকরি ইহা হইতে কিছু অমৃত ফল ফলিবে।' কিন্তু আশা করলেই হচ্ছে না। বিষবৃক্ষ থেকে কী তৈরি হবে সেটা বঙ্কিমচন্দ্রের জানা নেই। আমরা চিরকালের মানুষ, সে জমিদারই হোক, সম্রাটই হোক সে তার আবেগের কাছে ভিখিরি। নগেন্দ্রনাথ—তাঁর দিকে তাকান, কতবড়ো তাঁর সামাজিক অবস্থান। কিন্তু তিনিও একটা জায়গায় গিয়ে অতি করুণ মানুষ। মানুষের সমস্ত সীমাবদ্ধতার দ্বারা চিহ্নিত। সমস্ত রকমের অপরাধবোধ তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের অসহায়তা সে তো বঙ্কিমেরই তৈরি করা। কৃষ্ণকান্তের উইল-এ যে অসাধারণ গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের সংসার চিত্র—মনে হয় আহা। সব সংসারই যদি এরকম হত! সব বাঙালিই যদি এ রকম জীবন যাপন করত, এই রকম প্রেমময় স্ত্রী, এই রকম জীবন যাপন আমরা আশা করি কিন্তু কী হয়? কৃষ্ণকান্তের উইল অর্ধেকটা পার হতে না হতেই কী যে গরলের একটা সমুদ্রে পরিণত হয় চিন্তা করা যায় না। কে করে এটা? ইচ্ছা করে? বঙ্কিমচন্দ্রও তো চাননা এরকম হোক। বঙ্কিমচন্দ্র তো লিখতে লিখতে সতর্ক করছেন। গোবিন্দলাল যখন রোহিনীর মুখে মুখ দিচ্ছে তখন বেশ কয়েকটি বাক্য তিনি লিখেছেন, সতর্কও করেছেন। কিন্তু ঠেকানো যায়নি। এই মহা সর্বনাশ থেকে, এ আগুন থেকে ভ্রমর আর তার সংসারটিকে বাঁচাতে পারেন নি। তিনিই এই সংসার তৈরি করেছেন, তিনিই এই সংসার

আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছেন। এবং সেখানে মনে হয়, মানুষের জীবনের এই বাস্তবতার কাছে এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও অসহায়। রোহিণী যে রাস্তায় যাবে—গোবিন্দলাল যে রাস্তায় যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সাধ্য নেই তাকে টেনে একটা জায়গায় আটকে রেখে দেবেন।

মানুষের এই প্রবল বাসনাকে কী অসাধারণ ভাষাতে প্রকাশ করেছেন, এমন ওজস্বিতাপূর্ণ, এমন রসপূর্ণ, এরকম জ্যান্ত, রোমশ গদ্য পরবর্তীকালে আমরা তো আর রচনা করতে পারিনি। কাজেই আমার মনে হয় যেদিক থেকেই দেখুন-না-কেন, ওঁর যা আয়ু, সহসা নিঃশেষ হবার নয়। বাংলাদেশ তাঁকে স্বীকার করছে কী করছে না, কোন্ রাজনৈতিক কারণে তাঁকে সিলেবাস থেকে বের করে দিচ্ছে, কখনো প্রকাশককে বলছে বই ছাপতে পারবে না – এসব একেবারেই অবান্তর। যদি চোখের সামনে কালটাকে দেখি, যে কালের পটে আমি-আপনি ক্ষুদ্র পিপলিকাবৎ—আজ আছি কাল বুদ্‌বুদের মতো চলে যাব। ওই কালের দিকে যদি তাকাই তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র চিরকাল অপ্রতিরোধ্য, অপরাভূত একজন সাহিত্যিক, একজন শিল্পী, একজন প্রবল মানুষ হিসেবে আমাদের মধ্যে জীবিত থাকবেন।